মাসিক

পৃথিবী

ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

জুন ২০২৫
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩২
যুলহিজ্জা ১৪৪৬ মুহাররম ১৪৪৭
বর্ষ ৪৪
সংখ্যা ০৯

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩
দারসুল কুরআন
'সামূদ জাতির অবাধ্যতার পরিণাম'
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৫
দারসুল হাদীস ॥ ১৫
জীবনী
উমার (রা) এর জীবনের শেষের কয়েকটি দিন
ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ॥ ২৪
চিন্তাধারা
সোনার পাথর-বাটি যেমন সত্য নয়, তেমনি জিহাদও সন্ত্রাস নয়
আবুল আসাদ ॥ ৩০
উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশের তারতম্য: একটি পর্যালোচনা
ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী ॥ ৩৮
সংস্কৃতির ভিত রচনায় তাওহীদ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
আব্দুল মান্নান ॥ ৪৭
আন্তর্জাতিক
সিরিয়ায় কি কিছু ঘটবে?
মীযানুল করিম ॥ ৫৪
প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৮

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজিঃ ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা)-এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়। অথবা-
- ✳ ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

'ঈদুল আযহা বা কুরবানীর 'ঈদ ত্যাগের অনুপম অনুশীলনের এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। দ্বীনের প্রয়োজনে নিজের জান-মালকে আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দেওয়ার প্রত্যয়ই হলো 'ঈদুল আযহা। আযহা বা কুরবানীর মর্মকথা হলো নিজের সবকিছু- এমনকি প্রয়োজন হলে নিজের জীবনটাও আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দেয়া। মোট কথা একান্তভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে সপে দেওয়া বা আল্লাহর কাছে নি:শর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা।

কুরবানীর ইতিহাসের সাথে যাঁর নাম জড়িত তিনি হলেন, মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আ)। আল কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তার প্রভু তাকে বললেন, তুমি আত্মসমর্পণ কর। তিনি বললেন, আমি জগতসমূহের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।'

ইবরাহীম (আ) ছিলেন শিরকের বিরুদ্ধে এক আপোসহীন সংগ্রামী পুরুষ। শিরক নির্মূল করে নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই ছিল তার জীবনের একমাত্র ব্রত। তিনি শিরকপূর্ণ সমাজে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "আমি আমার নিজেকে সবদিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে নিবিষ্ট করলাম, যিনি আকাশসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (৬, সূরা আল আন'আম : আয়াত-৭৯)

তিনি আরো ঘোষণা দিয়েছিলেন, "আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ জগতসমূহের প্রভু আল্লাহর জন্য।" (৬, সূরা আল আন'আম : আয়াত-১৬২)

কুরবানীর সময় দু'আ হিসেবে এ আয়াত দু'টি পাঠ করা হয়। এর মাধ্যমে মূলতঃ শিরক মুক্ত হয়ে তাওহীদের ঘোষণা প্রদান করা হয়, যার অর্থ হলো নযর, মান্নত, কুরবানী, 'ইবাদাত বন্দেগী শুধুমাত্র আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর জন্যই করতে হবে, অন্য কারো জন্য করা যাবে না।

প্রাচীনকাল থেকেই পৌত্তলিকরা বিভিন্ন দেবদেবী, মূর্তি, গাছ, পাথর, আগুন, চন্দ্র, সূর্য, তারকা প্রভৃতির পূজা এবং তাদের নামে এবং তাদের জন্য নযর, মান্নত, কুরবানী প্রভৃতি করে আসছে। বর্তমানে এক শ্রেণীর মুসলিমও কিছু ব্যক্তির কবরকে মাযারে পরিণত করে সেখানে গরু, ছাগল, টাকা-পয়সা, খাবার প্রভৃতি মান্নত করছে, যা সুস্পষ্ট শিরক। আবার আরেক শ্রেণীর মানুষ কোনো নেতা, গুরুজন বা প্রসিদ্ধ কোনো ব্যক্তির ছবি ও ভাস্কর্য বানিয়ে তাতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। এটিও পৌত্তলিক সংস্কৃতির অংশ। এধরনের সকল শিরক থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সবকিছু করা ও নিবেদন করাই হলো ইবরাহীম (আ) প্রবর্তিত কুরবানীর মূল শিক্ষা।

কুরবানীর মূল চেতনা হলো আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন বা বিলিয়ে দেওয়ার চেতনাবোধ। এজন্য নিজের প্রিয় বস্তু, প্রিয়জন এমনকি নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হলে, অকাতরে তাও বিলিয়ে দিতে হবে। এ চেতনাবোধ ও এজন্য বাস্তব জীবনে তা প্রতিপালনে সদা প্রস্তুত থাকা, কোন বিপদাপদ বা বাধা প্রতিবন্ধকতায় দমিত না হয়ে তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় অটল অবিচল থাকাই কুরবানীর মূল শিক্ষা। এ শিক্ষা গ্রহণ না করে গরু-ছাগল যবেহ করে গোশত খেলে কুরবানীর প্রকৃত ফায়দা হাসিল হবে না। বরং কুরবানী দেওয়ার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর হুকুমেই সে তার মূল্যবান পশুটি কুরবানী করছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর অন্যান্য সকল হুকুমও প্রতিপালন করতে হবে, প্রয়োজনে নিজের জান কুরবান করে হলেও।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরবানীর গোশত এবং রক্ত কোনটিই আল্লাহর নিকট পৌঁছেনা। বরং তাঁর নিকট পৌঁছে শুধুমাত্র তোমাদের তাকওয়া (আল্লাহভীতি)।' (২২, সূরা আল হাজ্জ: ৩৭) সুতরাং শুধু পশুকে নয়, মনের পশু সত্ত্বাকেও কুরবানী করতে হবে। যাতে মন একান্তভাবে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। আল্লাহর ভয় ও তাঁর প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর দীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার দ্বারাই তা অর্জিত হতে পারে।

কুরবানীর গোশতের ক্ষেত্রেও সংযম ও ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিজে কম খেয়ে অন্যদেরকে, বিশেষ করে গরীব-দুঃখী মানুষকে বেশী করে দান করা প্রয়োজন। সামর্থবান ব্যক্তিদের উপর কুরবানী আবশ্যক। এ ধরনের ব্যক্তিরা সারা বছর গোশত কিনে খেতে পারে। এজন্য কুরবানীর গোশতে সে সব মানুষকে শামিল করা প্রয়োজন, যাদের গোশত কিনে খাওয়ার সামর্থ নেই। তাদেরকে বঞ্চিত রেখে নিজের ভোগ-সম্ভোগকে বৃদ্ধি করা কুরবানীর শিক্ষার সাথে মানানসই নয়। পশু কুরবানীর সাথে সাথে ভোগ লিপ্সাকেও কুরবান করতে হবে। কেননা ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হওয়াই কুরবানীর অন্যতম শিক্ষা। সুতরাং কুরবানীতে দুঃস্থ-দরিদ্রদের ভোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, নিজে কম খেয়ে অন্যকে বেশি খাওয়াতে হবে। ■

সংশোধনী

'মাসিক পৃথিবী'র মে-২০২৫ সংখ্যার সম্পাদকীয়ের তৃতীয় লাইনে (পৃষ্ঠা নং-৩) ১৯৮৬ এর স্থলে ১৮৮৬ হবে। অনাকাংখিত মুদ্রণ ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সামূদ জাতির অবাধ্যতার পরিণাম

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا}

অনুবাদঃ 'সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল, তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও। কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল। ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন', [আশ– শামস– ৯১: ১১– ১৪]।

নামকরণঃ আয়াতের প্রথম শব্দ (وَالشَّمْس وَضُحَاهَا) দ্বারাই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। যার অর্থ সূর্য। এখানে আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও এর আলোর শপথ করেছেন।

নাযিলের সময় ও বিষয়বস্তুঃ এটি একটি মাক্কী সূরা। এ সূরাটিতে পাপ ও পূণ্য এবং সৎ ও অসৎ এর পার্থক্য বুঝানো হয়েছে। আর যারা অসৎ ও পাপ না বুঝে দুনিয়াতে ঔদ্ধত্যের সাথে চলাচল করে তাদের কি পরিণাম হতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এক চরম অবাধ্য জাতি সামূদের আচার – আচরণ ও তাদের করুণ পরিণতির কথা উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন।

ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ

আল্লাহর বাণী, كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. 'সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল। সামূদ জাতি 'আদ জাতির মতো প্রাক ইতিহাসের প্রাচীন জাতি ছিল। সিরিয়া ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী একটি উপত্যাকায় বসবাস করত। আল–কুরআনের তথ্য থেকে জানা যায়, তারা 'আদ জাতির পরে আগমন করেছিল। তাদের সম্পর্কে আল–কুরআনে বলা হয়েছে,

{وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ}

'যখন আল্লাহ তোমাদেরকে 'আদ জাতির পরে স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন', [আল আ'রাফ– ৭: ৭৪]।

সামূদ জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামূদ জাতি কোন বেদুঈন জাতি ছিল না। বরং আল-কুরআন থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, তাদের নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষা ছিল। তারা আট্টালিকায় বসবাস করতো। তারা পাহাড় কেটে কেটে বাড়িঘর বানাতো এবং শীতকালে সেখানে বসবাস করতো। আল্লাহ বলেন,

{وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا}

'তিনি তোমাদের যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা যমীনের সমতলে ইমারত নির্মাণ করতে এবং পাহাড় কেটেও ঘর-বাড়ি তৈরী করতে', [আল-আ'রাফ- ৭: ৭৪]। আল্লাহ আরো বলেন,

{وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ}

'শহরে নয়টি গোত্র বসবাস করতো, তারা দেশের মধ্যে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতো', [আন-নামাল- ২৭: ৪৮]। এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সামূদ জাতি কোন বেদুঈন জাতি ছিল না বরং তারা সভ্য ও শহুরে জাতি ছিল। আল-কুরআন থেকে এটাও জানা যায় যে, তারা কৃষিকাজ করে জীবন যাপন করতো এবং তারা খুবই স্বচ্ছল ও জৌলুসপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ}

'তোমরা এখানে বাগ- বাগান, ঝর্ণাসমূহ, ক্ষেত-খামার, খেজুর বাগানে যে নিরাপত্তা ভোগ করছো , তা ছেড়ে দিতে চাচ্ছো?', [আশ- শু'আরা- ২৬: ১৪৬- ১৪৮]।

সামূদ জাতির 'আকীদা- বিশ্বাস, সামূদ জাতি ছিল পৌত্তলিক ও মূর্তিপুজারী; তারা বিভিন্ন দেব- দেবতার 'ইবাদাত করতো। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ}

'আর সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে পাঠাইছি। তিনি বলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, যিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই', [আল-আ'রাফ- ৭: ৭৩, হুদ- ১১: ৬১]।

সামূদ জাতির দুর্নীতি ও পাপাচারের একটি বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক বৈষম্য। একদল ছিল অহংকারী ও দাপুটে শ্রেণী আরেক দল ছিল দুর্বল ও শোষিত। সবল ও অহংকারীগণই সমাজের গরীব ও দুর্বল লোকদেরকে আল্লাহর নাবী সালিহ আলাইহিস সালামের তাওহীদের দা'ওয়াত শুনতে বাধার সৃষ্টি করতো। তাছাড়াও তারা দেশে নানা ধরনের বিশৃংখলা ও পাপাচার করে বেড়াত। বরং তারা দুরাচার সৃষ্টিতে নিমজ্জিত ছিল এবং অধিক পরিমাণ এ গুলোই করতো। তাদের আচরণ ছিল মানুষের উপর যুলম- নির্যাতন করা, নৈতিক চরিত্রের অধপতন ঘটানো এবং বড় ধরনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এমনটিই ফুটে উঠেছে। যা সূরা

আল–ফাজরের উল্লেখিত আয়াত দুটিতে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, 'তারা দেশের মধ্যে সীমালংঘণ মূলক কাজ করতো এবং তাতে ব্যাপক বিশৃংখলা সৃষ্টি করতো', ।

নাবী সালিহ ('আ) এর ভাষাতেও আল্লাহ তা'আল সে কথা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বলেন,

{فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ}

'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং কেবল আমারই আনুগত্য কর। আর সীমালংঘনকারীদের নির্দেশনা অনুসরণ করো না, যারা যমীনে দুরাচার সৃষ্টি করে এবং সংস্কার করে না', [আশ– শু'আরা– ২৬: ১৫০– ১৫২]। সমাজের অহংকারী শ্রেণীর সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করাও তাদের একটি নিকৃষ্ট কর্ম। তারা সবসময় সঠিক ও জ্ঞানীদের পথ– পন্থার বিপরীত কার্যক্রমই সমাজে প্রবর্তন করে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে।

সামূদ জাতি তাদের নাবীর সাথে কেমন আচরণ করতো, আল–কুরআনের তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, সামূদ জাতির হিদায়াতের জন্য নাবী সালিহ ('আ)কে তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তারা তার দা'ওয়াতের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব তো দেয়নি বরং তারা তাকে নানাভাবে মানসিক কষ্ট ও অপবাদে জর্জরিত করেছে। তারা কখনো তাকে যাদুগ্রস্ত লোক বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ}

'তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদে অন্তর্ভূক্ত', [আশ–শু'আরা– ২৬: ১৫৩, ১৮৫]। আবার কখনো তাকে মিথ্যাবাদী বলতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ}

'আমাদের মধ্যে কি তারই কাছে যিকর নাযিল করা হয়েছে? না, সে তো একজন মিত্যাবাদী, দাম্ভিক', [আল–কামার– ৫৪: ২৫]। তারা নিজেদের মূর্তি পুজার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার যুক্তি হিসেবে এ কথা বলতো যে, তাদের বাপ–দাদারা মূর্তিপুজারী ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ}

'তারা বলল, হে সালিহ! এর আগে তুমি আমাদের আশারস্থল ছিলে। তুমি কি আমাদেরকে তাদের 'ইবাদাত করতে নিষেধ করছ, যাদের 'ইবাদাত আমাদের পিতৃ–পুরুষেরা করত? নিশ্চয় আমরা সে বিষয়ে বিভ্রান্তকর সন্দেহে রয়েছি, যার প্রতি তুমি আমাদেরকে ডাকছ', [হুদ– ১১: ৬২]।

অতঃপর সামূদ জাতির লোকেরা নাবী সালিহ ('আ) এর দা'ওয়াতী কর্মের ব্যাপারে নিরাশ হলো এবং তাদের নেতারা দেখল যে, তার দা'ওয়াত সমাজের দুর্বল লোকরা

গ্রহণ করছে। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল তাদের স্বার্থ ও মান– সম্মানকে চরমভাবে আঘাত করা। তারা আরও দেখল যে, নাবী সালিহ ('আ) সামূদ জাতির দুর্বল লোকদেরকে টার্গেট করে তাদের বক্তৃতা প্রদান করছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে ডাকছেন যে, তোমরা কেবল আমারই আনুগত্য কর। স্বৈরাচারদের অনুসরণ করো না; কারণ তারা পৃথিবীতে দুরাচার সৃষ্টি করে এবং সংস্কার করে না। তারা যখন এমন অবস্থা দেখতে পেল তখন তারা আশংকা করল যে, তিনি তো তাদের এসব লোকদের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে। তাই তারা তাদেরকে সালিহ ('আ) এর সাথে সকল যোগাযোগ ছিন্ন করার আহ্বান জানাতে শুরু করে। মহান আল্লাহ সে কথা তুলে ধরে বলেন,

{قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ}

'তার কাওমের অহংকারী নেতারা সে সম্প্রদায়ের যারা ঈমান এনেছিল, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলল, তোমরা কি জান যে, সালিহ তার রব এর পক্ষ থেকে প্রেরীত? তারা বলল, নিশ্চয় তিনি যা নিয়ে প্রেরীত হয়েছেন, আমরা তার উপর ঈমানদার', [আল– আ'রাফ– ৭: ৭৫]।

শেষ পর্যন্ত তারা যখন সালিহ ('আ) এর ব্যাপারে ক্লান্ত– শ্রান্ত হয়ে পড়ল এবং তার প্রভাব তাদের সমাজের লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পড়ার হুমকি দেখা দিল, তখন তারা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করল। তারা সালিহ ('আ) এর কাছে তার দা'ওয়াতের সত্যতা ও বিশুদ্ধতার প্রমাণ তলব করল। এর মাধ্যমে তারা তাকে মু'মিনদের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করার অসৎ উদ্দেশ্য স্থির করেছিল। প্রকৃত অর্থে তার দা'ওয়াতের সত্যতার পক্ষে দলীল– প্রমাণ চাওয়া উদ্দেশ্য ছিল না। আবার প্রথমেই তাকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়নি। বরং তার কাছে বিভিন্ন প্রমাণাদি ও মু'জিযাহর দাবী করেছে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

{مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ}

'তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর', [আশ্– শু'আরা– ২৬: ১৫৪]।

মহান আল্লাহর বাণী, .**فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا** **'তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও'।**

সালিহ ('আ) এর দা'ওয়াতের কর্মসূচী যাতে করে অগ্রসর হতে না পারে, এ জন্যে তার জাতির অহংকারী নেতৃবৃন্দ সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এ জন্যে তারা নাবী সালিহ ('আ) এর নিকট তার পরিচালিত দা'ওয়াতের সত্যতার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণাদি ও মু'জিযাহ দাবী করে। তাদের ধারণা ছিল যে, তাদের এমন দাবী পুরণ করা এবং তাদের সর্বাত্মক

নেতিবাচক চেষ্টার মোকাবেলায় সালিহ ('আ) এর দা'ওয়াতী কর্ম নিয়ে এগিয়ে যাওয়া বা দীনকে বিজয় করার সক্ষমতা তার নেই। কিন্তু তাদের এ সব ধারণা ও আশংকাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে মহান রব আল্লাহ তা'আলা নাবী সালিহ ('আ) এর মু'জিযাহ স্বরূপ কঠিন পাহাড় চিরে তা থেকে একটি গর্ভবতী উট বের করে আনলেন। যে ধরনের উটের ব্যাপারে তারা নাবী সালিহ ('আ) এর সাথে চ্যালেঞ্জে গিয়েছিলেন। হুবহু সে রকমের একটি মু'জিযাহ তাদের হাতে তুলে দিলেন। মহান আল্লাহ সে কথা তুলে ধরে বলেন,

{قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

'নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, সে যমীনের উপর চরে খাবে এবং তোমরা তাকে মন্দভাবে স্পর্শ করবে না। তাহলে তোমাদেরকে যন্ত্রণাপদ শাস্তি পাকড়াও করবে', [আল-আ'রাফ– ৭: ৭৩]। অর্থাৎ নাবী সালিহ ('আ) এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে আটকানোর জন্য বলল যে, আপনি যদি সত্যিই নাবী হন তাহলে আমাদেরকে পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, (লাল রংয়ের) সবল ও স্বাস্থবতী উষ্ট্রী বের করে দেখাও। সালিহ ('আ) তাদের কাছ থেকে অঙ্গিকার নিয়ে মু'জিযাহ স্বরূপ এমন একটি উষ্ট্রীর জন্য দু'আ করলেন। এ মু'জিযাহ দেখে কিছু লোক সঙ্গে সঙ্গে ঈমান আনল। কিন্তু যারা দেব– দেবতার বিশেষ পুজারী ও ঠাকুর জাতীয় নেতারা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। তখন নাবী সালিহ ('আ) তার সম্প্রদায়ের প্রতি 'আযাবের আশংকা করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোন প্রকার কষ্ট দিও না। তাহলে হয়ত তোমরা শাস্তি থেকে বেঁচে যেতে পার।

আয়াতে এ উষ্ট্রীকে 'আল্লাহর উষ্ট্রী' বলার কারণ হচ্ছে, এটি আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন এবং নাবীর বিস্ময়কর মু'জিযাহ, বিস্ময়কারভাবে এর সৃষ্টি। তাই এর সম্মানের জন্যে 'আল্লাহর উষ্ট্রী' বলা হয়েছে, যেমন 'ঈসা ('আ)কে অলৌকিক পন্থায় সৃষ্টির জন্য তাকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়েছে, [তাফসীর ইবন কাসীর ২/৪৭৯, আল–বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১৫৪, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ১/৭৭৮]।

পানি পানে ভাগাভাগি, সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকে পানি পান করত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এ উষ্ট্রী যখন পানি পান করত তখন সব পানি পান করে ফেলত। আল্লাহ সুবহানাহুর নির্দেশে সালিহ ('আ) ফায়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্যদিন জীবজন্তুসহ কাওমের সবাই পানি নিবে, [তাফসীর ইবন কাসীর ৩/৪৪০]। আল–কুরআনেও এ পানি বন্টনের কথা উল্লেখ রয়েছে। করুণাময় আল্লাহ বলেন,

{وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ}

'আর আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, পানি তাদের (এবং উষ্ট্রীর) মধ্যে বন্টন হবে। প্রত্যেকে (পালাক্রমে) পান করতে উপস্থিত হবে', [আল- কামার- ৫৪: ২৮]। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ}

'সালিহ বলেন, এটা একটা উষ্ট্রী, এর জন্য পানি পানের ভাগ আছে এবং তোমাদের জন্য নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা আছে', [আশ্- শু'আরা- ২৬: ১৫৫]।

উষ্ট্রী হত্যা করার ঘটনা, মহান আল্লাহ বলেন, فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا} **'কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং উষ্ট্রীকে জবাই করল। ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন', [আশ- শামস- ৯১: ১৪]**। এ আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহ থেকে জানা যায় যে, সালিহ ('আ) এর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতৃবৃন্দ তাদের মাঝে উষ্ট্রীটির উপস্থিতিই তাদের বড় বিরক্তির উদ্রেককারী ছিল। কারণ তাদের মাঝে এর জীবন্ত উপস্থিতিই সামূদ জাতিকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে, আসলে তাদের উপর সালিহ ('আ) এরই বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপরও তারা তার উপস্থাপিত দা'ওয়াত নেহায়েত জিদ ও অহংকারের কারণে গ্রহণ করছে না বা বিশ্বাস করছেনা। অথচ তারা তাকে বুঝাতে চেয়েছে যে, তারা তার দা'ওয়াতকে এ কারণে গ্রহণ করতে পারছে না যে, এর সঠিক ও সত্য হওয়ার পেছনে কোন যুক্তি ও শক্তিশালী প্রমাণ নেই। সালিহ ('আ) মানষিকভাবে অসুস্থ কিংবা তার মতিভ্রম ও চিন্তার বিভ্রাট থেকেই সে এমন কিছু আমাদের সামনে পেশ করছে। অথবা এর মাধ্যমে সে আমাদের পূর্বপুরুষ ও বাপ-দাদার জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পোষণ করছে। কিন্তু তাদের চাহিদা অনুযায়ী অলৌকিক ও বিস্ময়করভাবে পাহাড় থেকে স্পষ্ট ও দৃশ্যমান উষ্ট্রী এসে যাওয়ার পর তার দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার আর কোন কারণ ও যুক্তি একেবারেই নেই। তাই সালিহ ('আ) এর দা'ওয়াত গ্রহণ করা তাদের জন্যই কল্যাণকর। কিন্তু তারা উল্টো পথে হেঁটে বিকার মানষিকতায় আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর নিদর্শন উষ্ট্রীটিকেই হত্যা করতে উদ্যত হলো। সালিহ ('আ) টের পেয়ে উষ্ট্রীর সাথে কোন প্রকার বেয়াদবী করা থেকে সাবধান করলেন অন্যথায় তারা আল্লাহর শাস্তিতে পতিত হবে। কিন্তু তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। মূলতঃ একজন দুষ্ট লোক হত্যা করলেও সকল নেতারাই এর সাথে জড়িত ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا

'তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে তখন তৎপর হয়ে উঠল', [আশ্- শামস- ৯১: ১২]। হত্যাকারীর নাম ছিল কিদার ইবন সালিফ। সে ঐ সমাজের একজন প্রিয় নেতা,

কঠিন প্রকৃতির হিংস্র ব্যক্তি ছিল’ [সাহীহুল বুখারী ৬/১৬৯, নং ৪৯৪২, সাহীহ মুসলিম৪/২১৯১, নং ২৮৫৫, আর দেখুন: তাফসীরুল বাগাভী ৮/৪৪০, তাফসীর ইবন কাসীর ৭/৪৭৯, ৮/৪১৩]। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

{فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ}

‘অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল, ফলে সে এটাকে হত্যা করল’, [আল– কামার– ৫৪: ২৯]। আল্লাহ সুবহানাহু আর বলেন,

{قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ}

‘যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তাতে কুফরীকারী? অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীকে হত্যা করে এবং তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করে’, আল আ'রাফ– ৭: ৭৭]।

সামূদ জাতির প্রতি শাস্তি ও এর ধরন: সামুদ জাতির অহংকারী কাফির নেতৃত্ব ও তাদের অনুসারীগণ উষ্ট্রীকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং আল্লাহ তা'আলা, তাঁর নাবী এবং নিদর্শনসমূহের সাথে তাদের প্রচন্ড জিদ, চরম ধৃষ্টতা ও বিদ্রোহ বেড়ে যায়। এমনকি তারা নাবী সালিহ ('আ) এর কাছে বারবার তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাস্তি নিয়ে আসার আহ্বান জানাতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ}

‘আর তারা বলল, হে সালিহ! তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এস, যদি তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাক’, [আল–আ'রাফ– ৭: ৭৭]। করুণাময় আল্লাহ তাদেরকে তাঁর নাবীর মাধ্যমে এক নিকটবর্তী শাস্তির কথা জানিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে তিন দিন পর্যন্ত সময় দিলেন, যাতে তারা তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও বিদ্রোহী আচরণ থেকে সঠিক পথে ফিরে এসে নাবীর দা'ওয়াত কবূল করে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ}

‘অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তাই তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের বাড়ি–ঘরে তিন দিন জীবন উপভোগ কর। এটা এমন এক প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয়’, [হুদ– ১১: ৬৫]।

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا}

‘অতঃপর তারা তাকে (নাবী সালিহ 'আ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল। ফলে তাদের পাপের কারণে তাদের রব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন [আশ্– শামস– ৯১: ১৪]। আয়াতে فَدَمْدَمَ শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি বা জাতির ওপর বারবার শাস্তি পতিত হয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেয়া বুঝানো হয়। আল্লাহ তা'আলা সামূদ জাতির বড়– ছোট ও যুবক– বৃদ্ধ সবাইকে আযাব দ্বারা

পরিবেষ্টন করে মাটির সাথে সমানভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, [তাফসীরুল কুরতুবী ২০/৭৯, তাফসীর ইবন কাসীর৮/৪১৪]।

শাস্তির ধরন: কুরআন মাজীদ থেকে আরো জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সালিহ ('আ) এর সম্প্রদায়কে তিন ধরনের শাস্তি প্রদান করেছিলেন;

এক. বিকট শব্দ, সামূদ জাতিকে বিকট শব্দ দ্বারা শাস্তি দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ}

'অতএব আমার শাস্তি ও ভীতিপ্রদর্শন কিরূপ কঠোর ছিল! নিশ্চয় আমরা তাদের উপর এক প্রচণ্ড আওয়াজ পাঠিয়েছিলাম। ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক খড়ের ন্যায় হয়ে গেল', [আল– কামার– ৫৪: ৩০– ৩১]। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজর এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে কোন নিদর্শন চেয়ো না। সালিহ ('আ) এর কাওম নিদর্শন চেয়েছিল। ফলে সেটা এ রাস্তা দিয়ে ঢুকত আর ঐ রাস্তা দিয়ে বের হত। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের রবের নির্দেশ অমান্য করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল। সে উষ্ট্রীর জন্য একদিনের পানি নির্দিষ্ট ছিল, আর তাদের জন্য তার দুধ নির্ধারিত ছিল অপরদিন। কিন্তু তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন তাদেরকে এক বিকট চিৎকার পেয়ে বসল। যা আসমানের নীচে তাদের যারা ছিল, একজন ছাড়া তাদের সকলকে দুর্বল করে দিল। সে ব্যক্তি (মাক্কায়) আল্লাহর হারামে ছিল। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি কে ছিল? তিনি বললেন, সে হচ্ছে, আবু রিগাল (أَبُو رِغَال)। কিন্তু সে যখনই হারাম থেকে বের হল তখনই তার পরিণতি তাই হয়েছিল যা তার সম্প্রদায়ের হয়েছিল', [মুসনাদ আহমাদ **২২/৬৬**, নং ১৪১৬০, মুস্তাদরাকে হাকিম ২/**৩৫১**, নং ৩২৪৮]।

দুই. ভূমিকম্প: সামূদ জাতিকে ভূমিকম্প দিয়ে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ}

'অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে (মরে) রইল', [আল–আ'রাফ– ৭: ৭৮]।

তিন. বজ্রপাত, সামূদ জাতির উপর কঠিন বজ্রপাত হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ}

'সামূদ জাতির ঘটনায়ও আছে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, ভোগ করে নাও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। অতঃপর তারা তাদের রবের আদেশের বিরোধিতা করল; ফলে তাদেরকে বজ্র পাকড়াও করল এবং তারা তা দেখছিল। তারপর তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না এবং প্রতিরোধও করতে সক্ষম হলো না', [আয্– যারিয়াত– ৫১ : ৪৫]।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, আসমান থেকে আসা বিকট শব্দে কঠিন ভীতির সৃষ্টি হয়, যা তাদের শ্রবণ শক্তির ওপর চরম আঘাত হানে, ফলে তাদের হৃদয় ও অন্তর– আত্মা প্রকম্পিত হয়ে উঠে। অথবা তাদের এলাকাতে ভীষণ মাপের ভূমিকম্প হয়। ফলে তারা হাঁটা চলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; কেননা চরম বিভিষিকা ও ভীতি তাদের শরীরের হাড়– হাড্ডিগুলোকে ভীষণ দুর্বল করে দেয়ায় তারা তাদের ঠাঁই উপুড় হয়ে পড়ে যায়। অতঃপর তারা চেয়ে চেয়ে দেখে যে, প্রচন্ড বজ্রপাত হচ্ছে আর তারাসহ তাদের বাড়ি–ঘর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}

'সুতরাং এটা তো তাদের বাড়ি–ঘর, তাদের যুলমের কারণে যা জন–মানবশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে সে সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে যারা জানে', [আন্– নামল– ২৭: ৫২]।

সামূদ জাতি শুধু আল্লাহর নিদর্শন 'উষ্ট্রী'কেই হত্যা করেনি, বরং তারা নাবী সালিহ ('আ)কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তাদের মধ্যের দুষ্ট লোকদের নয়জন নেতা এবং তাদের দলবল নিয়ে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা রাতের বেলা সালিহ ('আ)কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার বাড়ির পানে রওয়ানা হল। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় কৌশল অবলম্বন করে তাদেরকেই ধ্বংস করে দিলেন। তারা তা টেরও পেল না', [দেখুন: আন্– নামল: ৪৮–৫০, তাফসীরুল কুরতুবী ১৩/২১৫, তাফসীর ইবন কাসীর ৬/১৯৮]।

আল–কুরআন থেকে আর জানা যায় যে, নাবী সালিহ ('আ) ও তার অনুসারী মু'মিনগণ সামূদ জাতির অহংকারীদের ওপর শাস্তি আসার পর সেখান থেকে চলে যান এবং কাফিরদেরকে বলেন, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথা শোননি। করুণাময় আল্লাহ বলেন,

{فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ}

'তারপর তিনি তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আমার কাওম! আমি তো আমার রবের রিসালাত তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দ কর না', [আল– আ'রাফ– ৭: ৭৯]। আর সালিহ ('আ) এর কাওমের মু'মিনগণ এই কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ}

'অতঃপর যখন আমাদের শাস্তি আসল, তখন আমরা সালিহ ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে নাজাত দিলাম এবং সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করলাম। নিশ্চয় আপনার রব, তিনি শক্তিশালী, পরাক্রমশালী', [হুদ- ১১: ৬৬]।

কিছু হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাবূক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির ওপর শাস্তি এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আযাব বিধ্বস্ত এলাকার ভেতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যবহার না করে। আর যদি ঢুকতেই হয় তবে যেন ক্রন্দনরত অবস্থায় ঢুকে, [দেখুন, সাহীহুল বুখারী ১/৯৪, নং ৪৩৩, ৪/১৪৮, নং ৩৩৭৮, সাহীহ মুসলিম ৪/২২৮৫, নং ২৯৮০, ২৯৮১, কুরআনুল কারীম ১/৭৮২]।

শিক্ষাসমূহ: আলোচ্য আয়াতগুলোতে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষা উল্লেখ করা হলো;

এক. মহান করুণাময় আল্লাহর প্রতিষ্ঠিতি নীতি হচ্ছে, নাবী- রাসূলের মাধ্যমে মানব জাতিকে তাঁর দীনের দিকে দা'ওয়াত দেয়া ছাড়া শাস্তির ফায়সালা করেন না। সুতরাং সত্য পথের আহ্বানকে মানুষের বিবেচনায় নেয়া উচিত।

দুই. আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর দীনের অবাধ্যতাই মানব জীবনের বিপর্যয়ের কারণ। তাই আল্লাহর ক্রোধ ও প্রতিশোধ থেকে বাঁচা এবং উভয় জগতে সুখ- শান্তি নিশ্চিত করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে মানুষের তাঁর বাধ্যতার জীবন যাপন করা বাঞ্ছনীয়।

তিন. মানুষের অবাধ্য ও কামনার স্বেচ্ছাচার জীবন থেকে ফিরাতে বারবার অবকাশ দেয়া আল্লাহর সুন্নাত। কিন্তু তারা যখন অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে দুনিয়াতে ব্যাপক বিপর্যয় ও দুরাচার সৃষ্টি করে, তখন তিনি সেসব মানুষ ও জাতিকে সর্বাত্মক শাস্তির আওতায় ধ্বংস করে দেন। 'আল্লাহ শাস্তি প্রদানে সক্ষম' মানুষের তা ভালভাবে মনে রাখা উচিত।

চার. অতীত যুগের মানুষের ইতিহাস, মহান আল্লাহ, তাঁর নাবী-রাসূল এবং সাধারণ মানুষের জীবনে বিপর্যয়সৃষ্টিকারী কতিপয় মানুষের আচার- আচরণের ভিত্তিতে তাদের করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সচেতন মানুষের কর্তব্য।

পাঁচ. নাবী -রাসূল ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করা মহান আল্লাহর দায়িত্ব। অতীত যুগের ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। তাই সত্যপন্থী মু'মিনদের আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে নিশ্চিত আশাবাদী থাকতে হবে।

ছয়. আল্লাহর অবাধ্য, স্বৈরাচার, ও যালিমদেরকে অবকাশ ও ছাড় দেয়া হলেও তাদেরকে একেবারে ছেড়ে দেন না। তাই বাঁচতে হলে মানুষকে সত্য দীন ও আল্লাহর পথকেই আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য।

মহান দয়াময় আল্লাহ দারসের শিক্ষাগুলোকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন ও অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

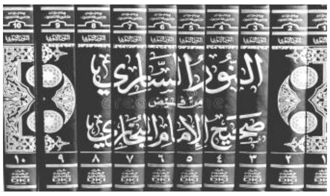

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ»؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ:

"আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কে এ কথাগুলো আমার নিকট থেকে গ্রহণ করে সেগুলোর প্রতি 'আমল করবে অথবা সে ব্যক্তিকে শিক্ষা দেবে যে সেগুলোর প্রতি 'আমল করবে? আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা), আমি। তখন তিনি আমার হাত ধরে পাঁচটি গণনা করলেন এবং বললেন : হারামকে বর্জন করো তাহলে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 'ইবাদাতকারী হবে। আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকো তাহলে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হবে। তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করো তাহলে মুমিন হবে। মানুষের জন্য তাই পছন্দ করো, যা তোমার নিজের জন্য পছন্দ করো তাহলে মুসলিম হবে। আর অধিক হেসো না, কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয়।"[১]

হারাম বর্জন করা : নিষিদ্ধ বা হারাম কাজের দিকে মানুষ সহজেই ঝুকে পরে। কারণ কুপ্রবৃত্তি মানুষকে নিষিদ্ধ কাজের দিকে প্ররোচিত করে এবং শয়তান মানুষকে সেদিকে চালিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। নফ্স বা প্রবৃত্তির চাহিদাকে অত্যন্ত সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনারোপা, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু এবং ফসল ইত্যাদি প্রবৃত্তির পছন্দনীয় বিষয়কে মানুষের জন্য সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। এগুলো পার্থিব জীবনের সামান্য ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁর নিকটেই

১. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৩০৫

রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।"[২] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

"আর আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করিনা। নিশ্চয় নফ্স বা প্রবৃত্তি মন্দ কাজের অধিক প্ররোচনা দানকারী।"[৩]

এভাবেই কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে মন্দ ও হারাম কাজে লিপ্ত করে। তখন মানুষ আল্লাহর আদেশ নিষেধ ভুলে গিয়ে, 'ইবাদাত বন্দেগী ছেড়ে বিপথে পরিচালিত হয় এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়। এ জন্য হারাম কাজকে পরিহার করার জন্য সবিশেষ তাকিদ দেওয়া হয়েছে এবং তার ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ "

"'আমির (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবন বাশীর (রা.) এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এর মাঝে রয়েছে সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ, যেগুলো সম্পর্কে অনেক মানুষ অবগত নয়। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো পরিহার করে সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্ভ্রমকে সংরক্ষণ করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহে লিপ্ত হবে, সে ঐ রাখালের ন্যায় যে নিষিদ্ধ সীমানার চারপার্শ্বে পশু চরায়, যার আশংকা রয়েছে অচিরেই তাতে ঢুকে পরার। জেনে রেখ! প্রত্যেক বাদশার-ই একটি নিষিদ্ধ সীমানা থাকে। জেনে রেখ! এ পৃথিবীতে আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমারেখা হলো তার হারামসমূহ। জেনে রেখ! নিশ্চয় মানুষের শরীরে একটি মাংশপিণ্ড রয়েছে। সেটি ঠিক থাকলে পূরো শরীর ঠিক থাকে। আর সেটি খারাপ হলে পুরো শরীর-ই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রেখ! সেটি হলো অন্তর।[৪]

أَنَّ ابْنَ مُنَبِّهٍ، كَانَ يَقُولُ: «أَعْوَنُ الْأَخْلَاقِ عَلَى الدِّينِ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا، وَأَوْشَكُهَا رَدًى اتِّبَاعُ الْهَوَى، وَمِنَ اتِّبَاعِ الْهَوَى الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا، وَمِنَ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ،

---

২. ৩, সূরা আলে 'ইমরান : ১৪)
৩. ১২, সূরা ইউসুফ : ৫৩)
৪. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু ফাজলি মান ইস্তাব্রাআ লি-দ্বীনিহি, হাদীছ নং ৫২)

وَمِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ اسْتِحْلَالُ الْمَحَارِمِ، وَمِنَ اسْتِحْلَالِ الْمَحَارِمِ يَغْضَبُ اللهُ،

ইবন মুনাব্বাহ বলতেন, দ্বীনের জন্য সবচেয়ে সহায়ক স্বভাব হলো দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হওয়া। আর সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। প্রবৃত্তির তাবেদারীর অন্যতম হলো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি। আর দুনিয়ার প্রতি আসক্তির অন্যতম হলো সম্পদ ও সম্মানের প্রতি আসক্তি। সম্পদ ও সম্মানের প্রতি আশক্তির অন্যতম কারণ হলো হারামকে হালাল মনে করা। আর হারামকে হালাল মনে করার কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।[৫]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদাত করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা, অন্য কারো নামে নযর মান্নত করা বা অন্য কারো নামে যবেহ করা, মৃত ব্যক্তি বা কবরবাসীর নিকট কোনো কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করা, ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম। এগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে হবে।

খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেগুলো পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। কতিপয় নারীকে মাহরাম ঘোষণার করে তাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যিনা ব্যভিচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুদ, ঘুষ, জুয়া, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, কারো অধিকার হরণ করা প্রভৃতিও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এগুলোকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে। যারা হারামগুলোকে হারাম মেনে বর্জন করে না তাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"আহলি কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম গণ্য করে না আর সত্য দ্বীনকে মেনে নেয় না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে।"[৬]

হারামে লিপ্ত থেকে আল্লাহর অনুগত ও 'ইবাদাতগুজার বান্দা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহর অনুগত বা 'ইবাদাতগুজার বান্দা হতে হলে হারামসমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। কারণ হারামের সাথে জড়িতদের 'ইবাদাত আল্লাহ গ্রহণ করেন না। এ প্রসঙ্গে হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

৫. মুসান্নাফ আবি শাইবা নং ৩৫১৬৮)
৬. ৯, সূরা আত্ তাওবা : ২৯)

آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ "

"আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র এবং পবিত্র ছাড়া তিনি অন্য কিছু গ্রহণ করেননা। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সে নির্দেশই দিয়েছেন, যে নির্দিশ তিনি রাসূলগণকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো এবং ভাল 'আমল করো, নিশ্চয় তোমরা যা করো আমি সে সম্পর্কে অবগত।[৭] এবং তিনি বলেছেন, হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার করো।[৮] অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করে এলামেলো চুল আর ধূলিমলিন চেহারা নিয়ে আকাশের দিকে স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারিত করে হে রব, হে রব বলে প্রার্থনা করে থাকে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং তার দেহ গঠিত হয়েছে হারামের দ্বারা। তাহলে কিভাবে তার দু'আ কবুল করা হবে?[৯] সুতরাং দুর্নীতিবাজ, ঘোষখোর, জাতীয় অর্থ আত্মসাৎকারী, ব্যাংক লোটপাটকারী, এবং অন্য যে কোনো হারামের সাথে জড়িতদেরকে সতর্ক হতে হবে। কারণ হারাম বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরও 'ইবাদাৎ কবুল করবেন না। আলোচ্য হাদীছে এ কথাই বুঝানো হয়েছে।

তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা : আল্লাহ যার জন্য যা বন্টন ও বরাদ্দ করেছেন, সে তাই পাবে। এ জন্য বরাদ্দকৃত অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। শত চেষ্টা করলেও তকদীরে যা আছে তার বেশী পাওয়া যাবে না। এ জন্য আল্লাহ যা দিয়েছেন সেটিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাহলে তার আর আকাঙ্ক্ষা থাকবে না এবং অধিক পাওয়ার পেরেশানী বা না পাওয়ার আফসোস থাকবে না।

প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে চরম পেরেশানীতে লিপ্ত করে এবং দ্বীন থেকে বিমুখ করে। এ ধরনের ব্যক্তি সর্বদা শুধু অর্থ-সম্পদের পিছে ছুটে বেড়ায়। রাশি রাশি সম্পদ লাভ হওয়া সত্বেও তার সম্পদের প্রতি লোভ দূর হয়না। তার সম্পদ যত বাড়ে অভাবও তত বাড়ে। কখনই তার প্রয়োজন শেষ হয়না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)

---

৭. আল মুমিনুন : ৫১)
৮. আল বাকারা : ১৭২)
৯. মুসলিম, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু কুবুলিস্ সাদাকাতি মিন কাসাবিত্ তায়্যিবি ওয়া তারবিয়াতিহা, হাদীছ নং ১০১৫)

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে। সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে। তোমরা তা দেখবে। আবার বলছি, নিশ্চয় তা নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষভাবে দেখবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নি'য়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[১০]

এ ধরনের দুনিয়া পুজারী লোকেরা আখিরাতে চরম শাস্তির সম্মুখীন হবে।

কিন্তু মুমিনের চরিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা সম্পদ লাভের পিছনে পেরেশান থাকেনা। বরং দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকে। ফলে তারা স্বল্প সম্পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তারা দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের সফলতার জন্য কাজ করে। জীবন ধারনের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী লাভের জন্য সময় নষ্ট না করে দ্বীনের কাজে পেরেশান থাকে। হাদীছে এটিকেই প্রকৃত ঐশ্বর্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ»

আবু হুরাইরা (রা.) সূত্রে নাবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সম্পদের প্রাচুর্যতা প্রকৃত ঐশ্বর্য নয়, বরং অন্তরের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য।"[১১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَرُزِقَ الْكَفَافَ، وَقَنَعَ بِهِ»

"'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস সূত্রে নাবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে ব্যক্তি সফল হয়েছে, যাকে ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে এবং শুধু প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং তাতেই সে সন্তুষ্ট।"[১২]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ، فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ»

"জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা অল্প সম্পদে তুষ্ট থাকো, কেননা অল্পেতুষ্টি এমন সম্পদ, যা শেষ হয়না।[১৩] সুতরাং আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং এর মধ্যেই প্রশান্তি নিহিত রয়েছে।

---

১০. ১০২, সূরা আত্ তাকাছুর :১-৮)
১১. বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক, বাবু আল গিনা গিনান নাফ্স, হাদীছ নং ৬৪৪৬)
১২. ইবন মাজাহ, কিতাবুয্ যুহ্দ, বাবুল কানা'আতি, হাদীছ নং ৪১৩৮)
১৩. (আল মু'জামুল আওসাত, হাদীছ নং ৬৯২২)

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ

প্রতিবেশীর সাধে সুসম্পর্ক ও সুন্দর আচরণের জন্য ইসলাম জোর তাকিদ দিয়েছে। প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে এতো বেশী তাকিদ দেওয়া হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আশংকা করতেন যে প্রতিবেশীকেও বোধ হয় উত্তরাধিকার দেওয়া হবে। এ বিষয়ে মাসিক পৃথিবী ফেব্রুয়ারী- ২০১৯ সংখ্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দকে তা দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিজের পছন্দের মতই অন্যের পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া

এ হাদীছে মুমিন হওয়ার জন্য নিজের যা পছন্দ তা অন্যের জন্যও পছন্দ করতে বলা হয়েছে। নিজের জন্য ভাল জিনিষ আর অন্যের জন্য মন্দ জিনিস পছন্দ করা মুমিনের কাজ নয়। কেননা মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "নিশ্চয় মুমিনগণ ভাই ভাই।"[১৪]

হাদীছে মুমিনদেরকে এক দেহের বিভিন্ন অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"আন নু'মান ইবন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, স্নেহপরায়ণতা ও মায়া-মমতার দিক থেকে মুমিনগণ এক দেহের ন্যায়। এর কোনো অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে সেজন্য গোটা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে ভোগে।"[১৫]

অন্য এক হাদীছে রয়েছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

"আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য 'ইমারততুল্য, যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে।"[১৬]

অন্য আরেক হাদীছে বলা হয়েছে,

أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى

---

১৪. ৪৯, সূরা আল হুজুরাত :১০)

১৫. মুসলিম, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, বাবু তারাহুমিল মুমিনীনা ওয়া তা'আতুফিহিম, হাদীছ নং ২৫৮৬)

১৬. প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৫৮৫)

الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ، لَا يَخْطُبِ امْرُؤٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، التَّقْوَى ههُنَا، وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ "

"আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এক মুমিন অন্য মুমিনের ভাই, সে তাকে অপদস্ত করবে না এবং তার প্রতি জুলুমও করবে না। তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের পিছে লেগে থেকো না, পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করোনা। বরং আল্লাহর বন্দাগণ ভাই ভাই হয়ে যাও। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ সম্মান ও শোনিত হারাম বা সম্মানার্হ। কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিয়ের উপর বিয়ের প্রস্তাব দেবে না এবং তার ভাইয়ের ক্রয়বিক্রয়ের উপর দরদাম করবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের শরীর ও আকৃতির দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি লক্ষ করেন তোমাদের অন্তরের দিকে। তাকওয়া এখানে এবং একথা বলে তিনি তাঁর বক্ষের দিকে ইশারা করলেন।[১৭]

সুতরাং এক মুমিন সর্বদা অন্য মুমিনের কল্যাণ কামনা করবে এবং সাধ্যমত তার উপকার করার চেষ্টা করবে। তার সুখে-দুঃখে অংশ গ্রহণ করবে ও সাহায্য করবে। কখনই তার কোনো ক্ষতি করার চিন্তাও করবে না। তাকে লাঞ্ছিত করবে না, তার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করবে না এবং তার দোষ ধরার জন্য বা তার ক্ষতি করার জন্য তার পিছে লেগে থাকবে না। হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»

"'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) সুত্রে নাবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে ব্যক্তিই মুসলিম যার কথা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির সে ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করে।"[১৮]

মোট কথা, একজন মুমিন কখনো অন্য মুমিনের অকল্যাণ বা ক্ষতির চিন্তা করবে না। বরং সর্বদা অন্য মুমিনের কল্যাণ ও উপকার করার চেষ্টা করবে, যেমন চেষ্টা করে নিজের কল্যাণ ও উপকারের জন্য। এধরনের মনমানসিকতা ও কর্মতৎপরতা ব্যতীত কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না। এজন্যই হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

---

১৭. বায়হাকী, শু'বুল ঈমান, অধ্যায় ৭৭, বাবু ফী আঁই ইউহিব্বুর রাজুলু লি আখিহিল মুসলিমি মা তুহিব্বু লি নাফসিহি... হাদীছ নং ১০৬৩৭)

১৮. বুখারী, কিতাবুল ঈমান , বাবু আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিল লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি, হাদীছ নং ১০)

"আনাস (রা.) সূত্রে নাবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না সে তার ভাইর জন্য তাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[১৯]

অতিরিক্ত হাসা

রাসূলুল্লাহ (সা.) অতিরিক্ত হাসতে নিষেধ করেছেন। কারণ অতিরিক্ত হাসলে অন্তর মরে যায়। সবসময় হাসাহাসি এবং হাসি তামাশা করলে মানুষ তার ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলে। তখন সে কোনো কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে না। হৃদয় দিয়ে কোনো কিছু অনুধাবন করা, অভিনিবেশসহ কিছু ভাবা, বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে সুক্ষ্ম বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, সুক্ষ্মদর্শিতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি হ্রাস পায়। ফলে কোনো কিছুর আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রকৃত অবস্থা অন্তর দিয়ে অনুভব করা তার জন্য সম্ভব হয় না। এ জন্য সে ভারত্ব হারিয়ে হালকা স্বভাবের লোকদেরর অন্তর্ভূক্ত হয়। তার হৃদয়ের প্রকৃত কার্যকারিতা বাস্তব অর্থে কার্যকর থাকে না। এটিকেই হাদীছে অন্তরের মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, অতিমাত্রায় হাসাহাসি ও হাসিতামাশা আর হাসিখুশি ও প্রফুল্ল থাকা এক জিনিস নয়। হাদীছে প্রথমটিকে নিষেধ করা হয়েছে, দ্বিতীয়টিকে নয়।

শিক্ষা :

১. হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। কারণ হারামে লিপ্ত ব্যক্তির 'ইবাদাত বন্দেগী আল্লাহ কবুল করেন না।

২. যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ যা ভাগ্যে রেখেছেন, তার বেশি পাওয়া যাবে না। সুতরাং দুনিয়া পওয়ার জন্য পেরেশান ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিৎ নয়।

৩. প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং তাদের সাথে সদাচার ও তাদের হক আদায় করতে হবে।

৪. নিজের ভালমন্দ ও অন্যের ভালমন্দকে একরূপ মনে করতে হবে। কারো ক্ষতি করার বা কাউকে কষ্ট দেওয়ার চিন্তাও করা যাবে না। বরং সর্বদা অন্যের উপকার করার চিন্তা করবে।

৫. ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ায় হাসি তামাশা বা অবহেলা করে সময় নষ্ট করা যাবে না, বরং সুচিন্তিতভাবে প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে এবং নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন।।

---

১৯. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ঈমানি আঁই ইউহিব্বা লি আখিহি মা ইউহিব্বু লি নাফসিহি, হাদীছ নং ১৩)

‘উমার (রা)-এর জীবনের শেষের কয়েকটি দিন

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্ত

‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা) খলীফা ‘উমার ফারুক (রা) এর জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তের কিছু কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে: ‘উমার (রা) এর ছুরিকাঘাতের পর অন্তিম সময়ে আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ‘হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনি জান্নাতের সুসংবাদ নিন! মানুষ যখন কুফরি করেছে আপনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মানুষ যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কে লাঞ্ছিত করেছে, আপনি তখন তাঁর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। আপনার খিলাফত পরিচালনার ব্যাপারে দু’জন মানুষও ভিন্নমত পোষণ করেনি। সর্বশেষ আপনি শহীদ হিসেবে নিহত হলেন।’ ‘উমার (রা) বললেন, তুমি তোমার কথাগুলো আমাকে আবার শোনাও তো। আমি আবার শোনালাম। তখন তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। এই পৃথিবীতে যত সোনা-রূপা আছে, সবই যদি আমার হাতে থাকতো, আর তার বিনিময়ে আমি সামনে যে ভয়াবহ অবস্থা আসছে তা থেকে মুক্তি পেতাম।” বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, এই যে তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচার্য ও সন্তুষ্টির কথা বললে, তা ছিলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তুমি আমার মধ্যে যে অস্থিরতা দেখছো, তা তোমার ও তোমার সঙ্গী সাথীদের জন্য। আল্লাহর কসম! পৃথিবীর সমান স্বর্ণ যদি আমার থাকতো আর তার বিনিময়ে আল্লাহর যে আযাবের মুখোমুখি আমি হবো, তা দেখতে না পেতাম।[১]

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর মধ্যে আল্লাহর শাস্তির ভয় কী পরিমাণ ছিলো তা কিছুটা অনুমান করা যায় এই বর্ণনার দ্বারা। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। তাছাড়া আল্লাহর হুকুম ও ‘আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জিহাদ করা, দুনিয়া বিরাগী জীবন যাপন করা, ইত্যাদি কাজের জন্য বিশাল শ্রম দান করেছেন। তারপরও তিনি মুসলিমদেরকে ভয়াবহ কিয়ামাতের দিন ও আল্লাহর কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন।[২]

তাঁর অন্তিম মুহূর্তের বর্ণনা ‘উছমান (রা) দিয়েছেন এভাবে : আমি তোমাদের সবার শেষে ‘উমার (রা) এর নিকট গেলাম। দেখলাম, তিনি তাঁর ছেলে ‘আবদুল্লাহর (রা)

---

১. বুখারী: কিতাবু ফাদায়িল আস-সাহাবা, নং ৩৬৯২।
২. ড. সাল্লাবী: ‘উমার ইবন আল খাত্তাব- ৫২৫।

কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। একটু পরে তিনি ‘আবদুল্লাহকে (রা) বললেন, তুমি আমার গাল মাটিতে রাখো। আমার উরু ও মাটি কি সমান সমান আছে? তোমার মার মরণ হোক! আমার উরু মাটির সাথে রাখো। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বার তিনি এ কথা বলেন। তারপর তিনি তাঁর দু’পা বিজড়িত করেন। তারপর আমি তাঁকে এ কথা বলতে শুনলাম: ‘আমার আফসোস! আমার মায়ের আফসোস! যদি না আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেন!’ তারপর তার রূহ বেরিয়ে যায়।

আমাদের লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তিনি ‘আশারা মুবাশ্‌শারা বিল জান্নাতি অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আল্লাহভীতি। তাঁর সর্বশেষ দু‘আর মধ্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলছেন, যদি আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা না করেন, তাহলে তাঁর আফসোসের শেষ নেই। তিনি নিজেকে আল্লাহর সামনে কত তুচ্ছ মনে করতেন এবং বিনয়ী ছিলেন, তাও দেখিয়ে গেছেন সর্বশেষ আচরণে। তিনি নিজের মুখমণ্ডলকে মাটিতে রাখার কথা বলছেন। এভাবে নিজেকে তুচ্ছভাবে তুলে ধরে আল্লাহর কাছে সর্বশেষ দু‘আ করছেন।

তাঁর মৃত্যুর সন-তারীখ এবং মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স

ইমাম আয যাহাবী (রহ) বলেন, হিজরী ২৩ সনের যিল হাজ্জ মাসের ২৬ অথবা ২৭ তারীখ বুধবার তিনি শাহাদাত লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। এটাই সঠিক বর্ণনা। আর ১০ বছর ৬ মাস খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেন।[৩] জারীর আল বাজালী বলেন, আমি একদিন যখন মু‘আবিয়ার (রা) কাছে ছিলাম, তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিলো ৬৩ বছর। তেমনি আবূ বাকর (রা) ও ‘উমার (রা) উভয়ে ৬৩ বছরে মৃত্যুবরণ করেন।[৪]

তাঁর গোসল, সালাতুল জানাযাহ ও দাফন

‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার (রা) বলেন, ‘তাঁকে গোসল দেওয়া হয়, কাফন পরানো হয় এবং তাঁর সালাতুল জানাযাহ আদায় করা হয়। আর তিনি ছিলেন একজন শহীদ।’ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে সে কি শহীদ হবে এবং তাকে কি গোসল দিতে হবে? এ ব্যাপারে ইসলামী বিশেষজ্ঞ ‘আলিমদের দু’টি মত আছে: (১) তাঁকে গোসল দিতে হবে। ‘উমার (রা) কে যে গোসল দেওয়া হয়েছিলো সেটাই তাদের দলীল। (২) তাকে গোসল দিতে হবে না এবং সালাতুল জানাযাহ আদায় করতে হবে না। আর ‘উমার (রা) এর ক্ষেত্রে যা করা হয়েছিলো তার জবাব তারা দিয়েছেন এভাবে : ‘উমার (রা) তো আঘাতের পর সেখানেই অনেকক্ষণ জীবিত ছিলেন। পানি ও চিকিৎসকের দেওয়া ঔষধও পান করেছিলেন। একারণে তাঁকে গোসল দেওয়া হয় এবং তাঁর সালাতুল জানাযাহ আদায় করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের শহীদদের যেমন করা হয়। যারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুর আঘাতের সাথে সাথে মারা যান- এমন শহীদদের গোসল দিতে হয় না। তাঁদের জন্য সালাতুল জানাযাহও আদায় করতে হয়

---

৩. প্রাগুক্ত-৫২৬।
৪. মুসলিম: ফাদায়িল আস-সাহাবা, নং ২৩৫২; মাহদুস সাওয়াব, ৩/৮৪৪।

না। কিন্তু যারা আহত অবস্থায় বেশ কিছু সময় বেঁচে থাকেন, কিছু পানাহার করেন, তাদের জন্য গোসল ও জানাযাহ দু'টিই আছে।[৫]

তাঁর সালাতুল জানাযাহ কে পড়ান?

ইমাম আয যাহাবী (রহ) বলেন, তাঁর সালাতুল জানাযার ইমামতি করেন সুহাইব ইবন সিনান (রা)।[৬] ইবন সা'দ বলেন, 'আলী ইবন আল হুসাইন সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবকে জিজ্ঞেস করেন, 'উমার (রা) এর সালাতুল জানাযাহ কে পড়ান? তিনি বলেন, সুহাইব। 'আলী আবার জিজ্ঞেস করেন, তিনি কয়টি তাকবীর দিয়েছিলেন? তিনি বলেন, চার তাকবীর। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, সালাতুল জানাযাহ কোথায় আদায় করা হয়েছিলো? তিনি বলেন, কবর ও মিম্বারের মাঝখানে। 'উমার (রা) তাঁর জীবনের শেষ সময়ে সুহাইব ইবন সিনান (রা) কে সালাতের ইমামতির দায়িত্ব দেন। তাই সমবেত মুসলিমগণ তাঁকেই 'উমার (রা) এর জানাযার সালাতের ইমাম বানান।[৭]

তাঁর দাফন

ইমাম আয যাহাবী (রহ) বলেন, তাঁকে নাবী (সা) এর হুজরাতে (শয়নকক্ষে) দাফন করা হয়। 'ইবনুল জাওযী জাবির (রা) এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, দাফনের সময় 'উমার (রা) এর কবরে যাঁরা নামেন তাঁরা হলেন, 'উছমান, সা'ঈদ ইবন যায়দ, সুহায়ব ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা)। হিশাম ইবন 'উরওয়া বলেন, উমায়্যা খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক ইবন মারওয়ানের সময়ে যখন রাসূলুল্লাহ (সা), আবূ বাকর (রা) ও 'উমার (রা) এর কবর ধ্বসে পড়ে তখন পুনর্নির্মাণকারীদের সামনে একজনের পায়ের পাতা বেরিয়ে পড়ে। তারা ধারণা করে এটা রাসূলুল্লাহর (সা) পায়ের পাতাই হবে। তাই ভীত-সংকিত হয়ে পড়ে। তারা তখন এমন কাউকে পেলো না যে নিশ্চিত করে বলতে পারে এটা কার পায়ের পাতা। এ সময় 'উরওয়া তাদেরকে বলেন, আল্লাহর কসম! না, এটা রাসূলুল্লাহ (সা) এর পায়ের পাতা নয়। এ 'উমার (রা) এর পায়ের পাতা ছাড়া আর কারো নয়। এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সা), আবূ বাকর (রা) ও 'উমার (রা) এ তিনজনকে মাসজিদে নাবাবীর ভিতরে 'আয়িশা (রা) এর হুজরার মধ্যে একই জায়গায় দাফন করা হয়েছে।[৮]

দাফনের পূর্বে 'আলী (রা) এর মন্তব্য

ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, 'উমার (রা) কে তাঁর খাটের উপর শুইয়ে দিয়ে লোকেরা যখন তাঁকে কাফন পরায় এবং উঠানোর পূর্বে তাঁর জন্য দু'আ করতে থাকে, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় পেছন থেকে এক ব্যক্তি আমার কাঁধে হাত দেয়। আমি তাঁকিয়ে দেখি 'আলী ইবন আবী তালিব (রা)। তিনি 'উমার (রা) এর প্রতি রহমত কামনা করে দু'আ করেন। তারপর বলেন, 'আপনার মতো 'আমলকারী

---

৫. মাহদুস সাওয়াব, ৩/৮৪৪-৮৪৫।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত; আত তাবাকাত- ৩/৩৬৬-৩৬৭।
৮. বুখারী: কিতাবুল জানায়িয, নং ১৩২৬; মাহদুস সাওয়াব- ৩/৮৪৭।

এমন কাউকে আপনি পেছনে রেখে যাননি, যে আমার সর্বাধিক প্রিয়পাত্র হতে পারে। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি, আল্লাহ আপনাকে আপনার দু'সঙ্গী-সাথীর সাথে মিলিত করবেন। আপনার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমি বহুবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে এ কথা বলতে শুনেছি:[৯]

ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر

"আমি, আবূ বাকর ও 'উমার গেলাম; আমি, আবূ বাকর ও 'উমার প্রবেশ করলাম এবং 'আমি, আবূ বাকর ও 'উমার বের হলাম।"

মুসলিমদের উপর তাঁর হত্যার প্রভাব

উমার (রা) এর শাহাদাত ছিলো মুসলিমদের জন্য খুব বড় ধরনের বেদনাদায়ক ঘটনা। এটা এমন নয় যে, তিনি কোনো মারাত্মক রোগে ভোগার পর মারা গেছেন। আর এই হৃদয় বিদারক ঘটনাটি ঘটে মাসজিদে - যখন তিনি সালাতুল ফজরের ইমামতি করছেন। মুসলিমরা যে কি পরিমাণ দু:খ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন, তা কিছুটা অনুমান করা যায় সে সময়ের কিছু মানুষের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। 'আমর ইবন মায়মূন বলতেন, 'এই দিনের পূর্বে মানুষের উপর যেন এতো বড়ো মুসিবাত আর কখনো আপতিত হয় নি।' 'উমার (রা) এর মৃত্যুর পর 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটু বের হলেন। যেখানেই তিনি কিছু মানুষের জটলা পেলেন, দেখতে পেলেন তারা বসে বসে কাঁদছে। যেন তারা তাদের বড়ো সন্তানদের হারিয়েছে।[১০] 'উমার (রা) ছিলেন হিদায়াতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। তিনি ছিলেন হক ও বাতিলের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিকারী। সুতরাং তাঁকে হারিয়ে মানুষের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়া স্বাভাবিক ছিলো। আহনাফ ইবন কায়িস (রহ) বলেন, 'উমার (রা) কে আঘাত করার পর তিনি সুহাইব (রা) কে সালাতের ইমামতির দায়িত্ব দেন। তাঁকে আরো দায়িত্ব দেয়া হয়, পরবর্তী খলীফার ব্যাপারে সবাই একমত না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী তিনদিন মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করার। যখন মানুষের সামনে দস্তরখান বিছিয়ে খাবার উপস্থিত করা হলো, তখন লোকেরা খাবার থেকে হাত গুঁটিয়ে নিলো। তখন 'আব্বাস (রা) বললেন, 'ওহে জনমণ্ডলী! রাসূলুল্লাহ (সা) এর মৃতুর পরও আমরা খেয়েছি, পান করেছি। তেমনিভাবে আবূ বাকর (রা) এর মৃত্যুর পরেও আমরা খেয়েছি, পান করেছি। মানুষকে অবশ্যই পানাহার করতে হবে। তাঁর এ কথার পর মানুষ হাত বাড়িয়ে খাবার উঠিয়ে খেতে লাগলো।[১১]

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) এর অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, 'উমার (রা) প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা শুনলেই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন এবং চোখের পানিতে কংকর দানা ভিজে যেত। তারপর তিনি বলতেন, 'উমার (রা) ছিলেন ইসলামের একটি দূর্গস্বরূপ। মানুষ তার মধ্যে প্রবেশ করতো, বের হতো না। এখন তিনি মৃত্যুবরণ করায় সেটি ছিদ্র হয়ে গেছে। মানুষ এখন ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।[১২]

৯. বুখারী: কিতাবুল মানাকিব, নং ৩৬৮৫।
১০. আল আশারা আল মুবাশশারুনা বিল জান্নাতি-৪৪।
১১. মাহদুস সাওয়াব- ৩/৮৫৫।
১২. আত তাবাকাত আল কুবরা, ৩/২৪৮; আখবারু 'উমার ৪২৫।

আর আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুর জাররাহ (রা) 'উমার (রা) নিহত হবার আগে থেকেই বলতেন, 'উমার (রা) এর মৃত্যুর পর ইসলাম দূর্বল হয়ে পড়বে। 'উমার (রা) এর মৃত্যুর পর আমি বেঁচে থাকি, আর সূর্য যার উপর উদিত হয় বা অস্ত যায় তার সবকিছুর কর্তৃত্ব আমার হাতে আসুক, তা আমার মোটেও পছন্দ নয়। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কেন? তিনি বলেন, তোমরা যদি বেঁচে থাকো তাহলে আমি যা বলেছি তা দেখতে পাবে।[১৩]

'আলী (রা) আরও মন্তব্য করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর পরে সর্বোত্তম মানুষ হলেন আবূ বাকর (রা), আর আবূ বাকর (রা) এর পরে সর্বোত্তম মানুষ হলেন 'উমার (রা)।[১৪] তিনি আরো বলেন, আমরা বলাবলি করতাম, ফেরেশতা 'উমার (রা) এর মুখ দিয়ে কথা বলে।[১৫] 'উমার (রা) এর মৃত্যুর পরে তিনি প্রায়ই কাঁদতেন। এজন্য তাঁকে বলা হলো- আপনি এতো কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, আমি 'উমার (রা) এর মৃত্যুতে কাঁদি। কারণ 'উমারের মৃত্যুতে ইসলামে এমন ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না।[১৬]

উঁচু স্তরের সাহাবায়ে কিরাম (রা) সারা জীবন 'উমার (রা) এর সুউচ্চ মর্যাদার কথা কখনো ভুলে যান নি। যখন 'আলী (রা) ও মু'য়াবিয়া (রা) এর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে, তখন সুওয়ায়িদ ইবন গাফলাহ নামক এক তাবি'ঈর পাশ দিয়ে 'আলী (রা) এর সমর্থক দু'ব্যক্তি আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা) এর সমালোচনা করতে করতে চলে যায়। সুওয়ায়িদ বিষয়টি 'আলী (রা) কে অবহিত করেন। তখন 'আলী (রা) এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, তাঁর দু'চোখের পাশ দিয়ে ঘাম ঝরে পড়তে থাকে। সাথে সাথে তিনি 'আস সালাতু জামি'আতুন' বলে মানুষকে সমবেত হবার আহ্বান জানান। লোকেরা সমবেত হলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণের কিছু কথা এখানে উপস্থাপন করা হলোঃ

"কিছু মানুষ এমন হয়েছে কেন, যারা দু'জন কুরাইশ নেতা ও মু'মিনদের পিতার সম্পর্কে এমন সব কথা বলে, যা বলা মোটেই সঙ্গত নয়। আমি এমন কথা থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত ও পবিত্র। এর জন্য তারা শাস্তি লাভ করবে। আল্লাহর কসম! কেবল মু'মিন, মুত্তাকিরা তাঁদেরকে ভালোবাসে, আর মুনাফিকরা তাঁদেরকে হিংসা করে। তাঁরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচার্য অবলম্বন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যেমন চেয়েছেন সেভাবেই তাঁরা আদেশ-নিষেধ করতেন। তাঁদের দু'জনের মতামতকে রাসূলুল্লাহ (সা) যে দৃষ্টিতে দেখতেন, আর কারো মতামতকে সেভাবে দেখতেন না। তাঁদের দু'জনকে যেভাবে ভালোবাসতেন, তেমন আর কাউকে ভালোবাসতেন না। তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। তাঁরা দুজনও দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, কিন্তু মু'মিনরা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট.........।"

আবূ বাকর (রা) এর পরে 'উমার (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অনেকে সন্তুষ্ট হলেন, আবার অনেকে সন্তুষ্ট হলেন না। তবে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার

১৩. আত তাবাকাত আল কুবরা, ৩/২৮৪।
১৪. আখবারু 'উমার ৪২২।
১৫. ইবনুল জাওযী, মানাকিবু 'উমার ২১২।
১৬. আখবারু 'উমার- ৪২২; আল ফাতূহাত আল ইসলামিয়্যাহ- ৪২৯।

পূর্বেই সবাই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তিনি খিলাফত পরিচালনা করেন নাবী (সা) ও তাঁর অগ্রগামী বন্ধুর নিয়ম-পদ্ধতি অনুসারে। তিনি তাঁদের দু'জনকে এমনভাবে অনুসরণ করেন, যেমন দুধ ছাড়ানো শিশু তার মাকে অনুসরণ করে। আল্লাহর কসম! তিনি ছিলেন একজন দয়ালু বন্ধু। আল্লাহর কোনো ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কাররের ভয় করতেন না। আল্লাহ তাঁর জবান দিয়ে সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এমন কি আমরা ধারণা করতাম ফেরেশতারা তাঁর জিহ্বা দিয়ে কথা বলে। আল্লাহ তাঁর ইসলাম গ্রহণের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন, আর তাঁর হিজরাত দ্বারা দীনকে মজবুত করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি মুনাফিকদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করেছেন, আর মু'মিনদের অন্তরে সৃষ্টি করেছেন প্রীতি ও ভালোবাসা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে শত্রুদের প্রতি শক্ত ও কঠোরতায় জিবরীলের (আ) সংগে তুলনা করেছেন। আর রাগ ও ক্রুদ্ধতার তুলনা করেছেন নূহ (আ) এর সাথে। তাঁদের দু'জনের মতো তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি? তাঁদের দু'জনের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন! তোমরা শুনে রাখ, কেউ যদি আমাকে ভালোবাসো তাহলে অবশ্যই তাঁদের দু'জনকে ভালোবাসতে হবে। আর কেউ তাঁদের দু'জনকে ভালো না বাসলে আমাকে রাগান্বিত করে তুলবে, তখন আমি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। আর শুনে রাখো, নাবী (সা) এর পরে এই উম্মাতের সর্বোত্তম দু'ব্যক্তি হলেন- আবূ বাকর ও 'উমার (রা)।[১৭]

'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলতেন, 'উমার (রা) কিতাবুল্লাহর জ্ঞানে আমাদের চাইতে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। আল্লাহর দীন বিষয়ে ছিলেন সবার চাইতে বেশি পারদর্শী। তাঁর ইসলাম ছিলো- বিজয়, হিজরাত ছিলো- সাহায্য এবং দেশ পরিচালনা ছিলো- রহমত স্বরূপ।[১৮]

আবূ তালহা আল আনসারী (রা) বলতেন, আল্লাহর কসম! মুসলিমদের বাড়ির এমন কোনো পরিবার নেই, 'উমার (রা) এর মৃত্যুতে তাদের দীনে কিছু ত্রুটি দেখা দেয়নি এবং জীবিকায়ও স্বল্পতা ঘটেনি। হুযায়ফা (রা) বলেন, 'উমার (রা) এর সময়ে ইসলাম ছিলো সেই ব্যক্তির মতো, যে সব সময় মানুষকে স্বাগতম জানায়। আর 'উমারের (রা) মৃত্যুর পর তা হয়ে যায় সেই ব্যক্তির মতো যে সব সময় মানুষকে পিঠ দেখিয়ে ফিরে যায়।[১৯] সব মানুষের জ্ঞান যেন 'উমারের (রা) বুকে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। আল্লাহর কসম! একমাত্র 'উমার (রা) ছাড়া আমি এমন আর কোনো মানুষকে জানিনা, যাকে আল্লাহর ব্যাপারে কোনো তিররস্কারকারীর তিরস্কার শুনতে হয়নি।

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর তিরোধানের পর থেকে 'উমার (রা) এর চাইতে বেশি কর্মঠ, আর দানশীল আমি কাউকে দেখিনি। (চলবে)

---

১৭. আখবারু 'উমার ৪২৩-৪২৪।
১৮. ইবনুল জাওযী, তারীখ আল খুলাফা- ৪৭; মানাকিবু 'উমার ২১৪।
১৯. তাবাকাতু ইবন সা'দ ১/২৭১; ইবনুল জাওযী: মানাকিবু 'উমার ২১৪।

সোনার পাথর-বাটি যেমন সত্য নয় তেমনি জিহাদও সন্ত্রাস নয়

আবুল আসাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন হলো, 'সোনার বাটিকে 'পাথর-বাটি' বলার এই অব্যাহত প্রতারণা কেন? সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যার যুদ্ধ, সেই ইসলামকে কেন সন্ত্রাসী সাজানো হচ্ছে, ইসলামের পবিত্র যুদ্ধকে কেন সন্ত্রাস বলা হচ্ছে। অথচ শুধু যুদ্ধ নয়, ইসলাম সব রকম চরমপন্থা পরিহার করতে বলে, সব ক্ষেত্রেই ইসলাম মধ্যমপন্থা অনুসরণ করে। কাজ, কর্ম, মামলা-মুয়ামেলাত সবক্ষেত্রে সুবিচার ও নীতিবোধকে প্রাধান্য দিতে বলে। এমনকি শত্রু কিংবা শত্রু-জাতির ক্ষেত্রেও সুবিচারকেই সিদ্ধান্তের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, "হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনে অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।" (সুরা মায়িদা, আয়াতঃ ২) এই একইকথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও এক জায়গায় বলছেন, "কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" (সুরা মায়িদা, আয়াতঃ ৮) এই দুই আয়াতে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কেউ বা কোন জাতি শত্রু হলেও, তার বা তাদের প্রতি বিদ্বেষ-শত্রুতা থাকলেও তার বা তাদের প্রতি অবিচার করা যাবে না, ন্যায়ের সীমালংঘন করা যাবে না। ইসলামের পবিত্র জিহাদ যা খোদ সন্ত্রাসেরও বিরুদ্ধে, তাকে সন্ত্রাস, সন্ত্রাসের উৎস বলা হচ্ছে কেন?

এই প্রশ্নের জবাব গ্লোবাল পলিটিক্স এবং আধুনিক বিশ্ব রাজনীতির যুদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে পাওয়া যাবে। আজকের এই বিশ্ব রাজনীতি এক বা একাধিক বিশ্বশক্তির জন্ম দিয়েছে যার 'ওয়ার মেশিন' চালু রাখার জন্যে বিশ্বের সব জায়গায় তাদের উপস্থিতি অপরিহার্য করে তোলার জন্যে এবং বিশ্বের চারদিকে তার প্রভুত্বের ছড়ি ঘুরানোকে

যৌক্তিক করার জন্যে সবসময় তার জন্যে একটি ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ দরকার। 'ভয়ঙ্কর কম্যুনিজম-এর পতন এবং ভয়ংকর প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর আজকের বিশ্ব শক্তির সামনে ভয়ঙ্কর কোন প্রতিপক্ষ থাকে না। এর ফলে তার 'ওয়ার মেশিন' অপ্রয়োজনীয় ও সংকুচিত হয়ে পড়ার উদ্বেগ দেখা দেয় এবং বিশ্বের সব জায়গায় তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা হুমকির সম্মুখিন হয়। এই অবস্থার নিরসনের জন্যেই 'ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ' হিসাবে ইসলামকে বাছাই করা হয়। বার্লিন ওয়াল ধসে পড়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিশ্ব শক্তি থেকে সাধারণ পর্যায়ে যখন নেমে আসে, সেই সময় মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যাকনামারা সিনেটের বাজেট কমিটিতে দেয়া এক অফিসিয়াল বক্তব্যে বলেছিলেন, "U.S. defense spending could safely be cut in half. It became clear the U.S had to either undergo massive shifts in spending, a painful and unwelcome prospect for the defense establishment, or find new justification for continuing high levels of military expenditure." (The war on Islam, Envar Masud) অর্থাৎ মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট এখন খুব সহজেই অর্ধেকে কমিয়ে আনা যায়। এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে পড়েছে, এখন হয় মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট বিপুলভাবে কমিয়ে আনতে হবে যা হবে খুবই বেদনাদায়ক ও অগ্রহণযোগ্য আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্যে, অন্যথায় আমাদের বিরাট রকম সামরিক ব্যয় অব্যাহত রাখার পক্ষে নতুন যুক্তি দাঁড় করাতে হবে।' এই নতুন যুক্তিই হলো নতুন শত্রু, নতুন প্রতিপক্ষ। তারা নতুন প্রতিপক্ষ খুঁজতে গিয়ে বাছাই করে ইসলামকে। এনভার মাসুদ লিখেছেন, "The magnitude of U.S. defense spending fuels the search for enemies. With the collapse of the Soviet Union, the choice was between the Yellow Peril (East Asia) and the Green Peril (Islam). Islam was chosen." (The war on Islam, Envar Masud, Page-207). অর্থাৎ মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বিশাল বপুর দায়ই তাদেরকে শত্রু খুঁজতে বাধ্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দুইটি বিকল্পের দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ে। একটি হলো 'হলুদ বিপদ' মানে 'পূর্ব এশিয়া' অন্যটি হলো 'সবুজ বিপদ' অর্থাৎ ইসলাম। এই দুই বিপদের মধ্যে ইসলামকেই তারা প্রথম শত্রু হিসেবে বেছে নেয়।

ইসলামকে শত্রু হিসাবে বাছাই এর পর প্রয়োজন দেখা দিল শত্রু হিসাবে তাকে দাঁড় করানোর। শুধু দাঁড় করানো নয়, দাঁড় করাতে হবে শত্রুর ভয়ঙ্কর রকমের ইমেজ দিয়ে। কিন্তু তখন ইসলামের ইমেজে ভয়ঙ্কর কিছু ছিল না। সন্ত্রাসের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে তারা হুমকি হওয়া তো দূরে থাক, মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনার বিষয়ও ছিল না। ফিলিস্তিনের মত কিছু দেশে সন্ত্রাস বলার মত যেটুকু কাজ

ছিল তা ছিল মূলতঃ পশ্চিমা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অমুসলিমদের দ্বারা যে সন্ত্রাস হতো সেটুকু সন্ত্রাসও মুসলমানদের মধ্যে সেখানে ছিল না। মৌলবাদ বা চরম পন্থা কাউকে শত্রু সাজাবার ইস্যু হতে পারে। কিন্তু এদিক থেকে মুসলমানরা এমনকি খৃস্টানদেরও পেছনে ছিল। বলা হয়েছে, "As for fundamentalism, Islam has no harallel to the U.S. Protestant Christian movement which opposed modern scientific theory. Rather, Islam has, from its birth, stressed the use of reason and logic", অর্থাৎ মৌলবাদিতার দিক থেকে ইসলাম এমনকি প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টানদের মতও গোঁড়া নয়। মার্কিন খৃস্টান প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলন বিজ্ঞানের তথ্য তত্ত্বের বিরোধিতা করে। অথচ ইসলাম শুরু থেকেই ন্যায় ও যুক্তির পক্ষে।

'ভয়ঙ্কর ইমেজ তৈরির উপকরণ হিসেবেই সম্ভবত এই সময় মুসলিম দেশে কেমিক্যাল ও বায়োলোজিক্যাল উইপনস (CBW) থাকার অভিযোগ উঠে। সুদান হয় প্রথম টার্গেট। তখন পর্যন্ত অবয়বহীন-অজ্ঞাত 'আল-কায়েদা এবং তার নেতা হিসাবে মার্কিনীদের সহযোগী 'বিন লাদেন'-এর কথা প্রচারিত হয়। অভিযোগ উঠে লাদেনের তত্ত্বাবধানে সুদানের 'আল শিফা' ফ্যাক্টরীতে বায়োলজিক্যাল উইপনস তৈরী হচ্ছে। অভিযোগ তুলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে সে ফ্যাক্টরী ধ্বংস করে দেয়। এই ধরনেরই অভিযোগ তোলা হয় লিবিয়ার 'তারহুনা' পাম্প স্টেশন সম্পর্কে। বলা হয় ওটা বায়োলজিক্যাল অস্ত্র উৎপাদনক্ষম একটি কেমিক্যাল প্ল্যান্ট। বলা হলো, প্রয়োজন হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে প্ল্যান্ট আণবিক বোমা মেরে ধ্বংস করে দেবে। আসলে ওটা ছিল একটা সেচ প্রকল্প। অনুরূপভাবে প্রমাণ হয় যে, সুদানের আল-শিফা ফ্যাক্টরী নিছকই একটা ওষুধ ফ্যাক্টরী ছিল। New York Times এর বরাত দিয়ে লিখা হয়, "Hours after they launched cruise missile at the factory on August 20, senior national security advisers described Al-Shifa as a secret chemical weapons factory financed by Bin Laden. But now, says the New York Times, State Department and CIA officials argue that the government cannot justify its actions." ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ৮ দিন পর New York Times লিখে "The plant made both medicine and... drugs according to U.S and European engineers and consultants who helped build, design and supply the plant."

এসব ঘটনা 'ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ' দাঁড় করাতে ব্যর্থ হবার পর নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ঘটে। অকল্পনীয় ও ভয়ঙ্কর এই ঘটনার দায় 'আল-কায়েদা' ও 'লাদেন'-এর উপর চাপানো হয় এবং তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপন করা

হয়। অথচ আল-কায়েদা ও লাদেনকে না মুসলিম দুনিয়ার কেউ চেনে, না তারা ইসলামের কেউ। কিন্তু এদেরকেই ইসলাম ও মুসলমানদের সিম্বল হিসেবে সামনে রেখে নাইন-ইলেভেনের ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্যে আকাঙ্ক্ষিত 'ভয়ঙ্কর শত্রু বা প্রতিপক্ষ' রূপে ইসলাম ও মুসলমানদের দাঁড় করানো হয়। শুরু হয় 'War on Terror'.

এবার বাংলাদেশের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে আসা যায়। সুমন চক্রবর্তী বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি বলেছেন। দেখা যাক এই উক্তির পেছনের ইতিহাস কি। বলা যায়, বাংলাদেশের ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা হামলা এবং তার পরবর্তী আত্মঘাতী ও রক্তাক্ত বোমা হামলার ঘটনাসমূহ নাইন-ইলেভেন ঘটনারই অনুরূপ। নাইন-ইলেভেনের মতই একটা অপরিচিত অদৃশ্য, অজ্ঞাত ইসলামী নামের সংগঠনের দ্বারা এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং একইভাবে ইসলামকে খুনি ও বর্বর ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রধান উৎস মাদরাসাকে সন্ত্রাসের ক্ষেত্র হিসাবে অভিহিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এক শ্রেণীর পত্রপত্রিকা এবং সুমন চক্রবর্তী ও হিরন্ময় বাবুদের মত বাংলাদেশেরও এক শ্রেণীর মানুষ অব্যাহতভাবে এই অভিযোগ তুলছে। অথচ উপরে ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাস এর আলোচনায় আমরা দেখেছি ইসলামী কোন সংগঠন এবং ইসলামপন্থী কোন ব্যক্তি বা শক্তিরা এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে না। এই ধরনের ঘটনা তারাই ঘটাতে পারে যারা রাষ্ট্র ও সরকারকে ব্যর্থ করে দেশকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলতে চায়, যারা বিকাশমান গণতন্ত্রকে ব্যর্থ করতে চায়, যারা দেশ ও জনগণের আদর্শিক প্রতিরক্ষা ধ্বংস করার জন্য ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের খুনি, সন্ত্রাসী হিসাবে দেখাতে চায়। তারাই কিছু অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত ও বেকার কিছু অল্প বয়স্ক ছেলেকে ও বিপথগামী কিছু মানুষকে ইসলামের পোশাক পরিয়ে দেশে একই দিনে একই সময়ে প্রায় ৫ শতাধিক বোমা ফাটায় এবং এরাই দেশের বিচারক ও বিচারালয়ের উপর বোমা হামলা করে। ভারতের আধ্যাত্মিক নেতা মিঃ গান্ধী বলেছেন, "The spirit of democracy cannot be established in the midst terrorism, whether governmental or popular'. অর্থাৎ সন্ত্রাসের মাঝে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জর্জ ওয়াশিংটন বলেছেন, 'The administration of justice is the firmest pillar of the government.' অর্থাৎ বিচার বিভাগই হচ্ছে সরকারের সবচেয়ে সুদৃঢ় স্তম্ভ।' বাংলাদেশে এই গণতন্ত্র এবং এই বিচারবিভাগকেই টার্গেট করা হয়। দেশকে বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করাই এদের টার্গেট। কোন ইসলামী চরিত্রের মানুষের পক্ষে তার দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে এই অপরাধ করা সম্ভব নয়। এই সন্ত্রাসীরা ইসলামের তো কেউ নয়ই, দেশেরও কেউ নয়। কলামিস্ট ফরহাদ মাজহার সত্যিই লিখেন, বিদেশী হাত এর সাথে জড়িত। তার ভাষায়, "যারাই নিরাপত্তা, যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধ কৌশল নিয়ে পড়াশোনা করেন ও খোঁজ-খবর রাখেন, তারা জানেন যে, নাম না

জানা যে সব ইসলামী দল, যাদের আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, তাদের হাতে যখন বোমা-বারুদ চলে আসে, তখন সাধারণভাবে বুঝতে হবে এটা ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কাজ। এটা সাধারণ প্যাটার্ন। ইসলামী জঙ্গীদের সাথে ইসরাইল-ভারত-মার্কিন নিরাপত্তা আঁতাতের কারণে উপমহাদেশে নব্বই দশকের শেষ বছরগুলো থেকে এ ধরনের তৎপরতা আমরা বাংলাদেশে লক্ষ্য করছি। ইসরাইল জানে যে, আরবদের মধ্যে ইসরাইলকে টিকিয়ে রাখা ও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে আরব ও ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বে ভাবমূর্তি নষ্ট করার উপর। অর্থাৎ প্রমাণ করতে হবে, ইসলাম মাত্রই একটি বর্বর ধর্ম, 'এরা নির্বিচারে বোমাবাজি করে, নিরীহ মানুষ হত্যা করে।' মুসলমান সন্তানরা শিশু বয়স থেকেই অন্যদের ঘৃণা করতে শেখে এবং মাদরাসায় গিয়ে তারা জিহাদী হয়ে বেরিয়ে আসে। সেই বোমা হামলার পরপরই গণমাধ্যমগুলোর উৎকট চিৎকারের মধ্যে এই ইসরাইলী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের প্রচারণাই আমরা দেখেছি।"

ফরহাদ মাজহার ঘটনার প্যাটার্ন এবং টার্গেট প্যাটার্ন দেখে এই অনুমান করেছেন। কিন্তু এটা অনুমান নয়, এটাই সত্য। একই ধরনের ঘটনাও টার্গেট প্যাটার্নে সংঘটিত নাইন-ইলেভেনের ঘটনার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। কিন্তু হিমালয় সমান প্রচার-প্রপাগাণ্ডার আড়ালে আসল সত্য চাপা পড়ে, তবু এটাই সত্য হয়ে থাকবে যে, নাইন-ইলেভেনের ঘটনাও ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ও তার সহযোগীদেরই কাজ। এ সম্পর্কে Enver Masud মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া থেকে প্রকাশিত তার গ্রন্থ "The War on Islam'-এ লিখেছেন, "On the day of the attack on America, the Washington Times quoted a paper by the Army School of Advanced Military Studies which said that the MOSSAD, the Israeli Intelligence Service, 'has the capability to target U.S. forces and make it a Palestinian/Arab act.' This, coupled with arrest in the U.S. of dozens of suspected Israeli spies and reports that several of the alleged hijackers that struck the World Trade Center were still alive, fuelled alternative theories." অর্থাৎ যেদিন আমেরিকা আক্রান্ত হয়েছিল ঐদিন 'ওয়াশিংটন টাইমস' পত্রিকা 'আর্মি স্কুল অব এডভান্সড মিলিটারী স্টাডিজ এর বরাত দিয়ে ছাপা একটা নিউজে বলেছিল, ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' এরই শুধু মার্কিন সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করা এবং একে ফিলিস্তিনী অথবা আরবদের কাজ বলে চালিয়ে দেয়ার যোগ্যতা রয়েছে। এর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েক ডজন ইসরাইলী গোয়েন্দা গ্রেফতার হওয়ারও খবর রয়েছে। কিন্তু এ খবর এবং খবর প্রকাশের কণ্ঠ মার্কিন ও বিশ্ব মিডিয়ার পরিকল্পিত কোরাশের মধ্যে সকলের কানে পৌঁছেনি। কিন্তু এই সত্য চর্চা বন্ধ হয়নি।

একদিন এই সত্যই সকল মিথ্যার উপর মাথা তুলে দাঁড়াবে।

ফরহাদ মাজহার ইসরাইলী-ভারতীয় উদ্দেশ্যের পক্ষে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের উৎকট চিৎকারের কথা বলেছিলেন। এই উৎকট চিৎকার শুধু আমাদের গণমাধ্যমে নয়, গোটা বিশ্বের গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয় এই চিৎকার। ভারতের গণমাধ্যম ও জননেতারা এইভাবে চিৎকার শুরু করে যে জিহাদীরা যেন বাংলাদেশ গিলে ফেলেছে এবং ভারতকেও গিলে ফেলতে অগ্রসর হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাংলাদেশ-পরিস্থিতিকে ভারতের জন্যে থ্রেট' হিসাবে অভিহিত করে। গোটা এই প্রচারণা অপরিকল্পিত নয়, ঘটনার মতই পরিকল্পিত। এই ঘটনার সাথে উপমহাদেশের আরেকটা ঘটনার হুবহু মিল পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর দয়ানন্দ সরাস্বতি প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ এর একজন নেতা এবং ভারতে 'শুদ্ধি আন্দোলন' এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। একজন মুসলমান এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেফতার হয়। শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে ইসলাম বিরোধীরা এ ঘটনার জন্যে গোটা মুসলিম জাতিকে এবং ইসলামের মূল আদর্শকেই দায়ী করতে আরম্ভ করে। তারা এমনকি আল-কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, কুরআনের শিক্ষাই মুসলমানদের হিংস্র করে তোলে এবং তা সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সহাবস্থানের পরিপন্থী। এমনও প্রচার চলে যে, পৃথিবীতে যতদিন কুরআনের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সে সময়ের পত্র-পত্রিকাগুলোই এই অপপ্রচারের সূচনা এবং মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। তারা মানুষকে উস্কে দেবার জন্যে বলে, ঘাতক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আপন ধর্মের শত্রু মনে করেই হত্যা করেছে এবং উক্ত সৎ কাজ দ্বারা সে জান্নাত পাওয়ার আশা করে। সে সময় আমাদের গণমাধ্যমের একটা বড় অংশ উৎসাহের সাথে কমবেশি এই প্রচারণাই চালায়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তখন পত্র-পত্রিকা ছিল হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে, আর এখন গণমাধ্যম মুসলমানদের নিজেদেরই। ফরহাদ মাজহারের কথাই ঠিক, বাংলাদেশে অব্যাহত বোমা হামলার ঘটনা যে ষড়যন্ত্রের ফল, আমাদের গণমাধ্যমের ঐ অংশটি সে ষড়যন্ত্রেরই শিকার।

এই ষড়যন্ত্র ছিল অনেকদিনের এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল। বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী মৌলবাদী রাষ্ট্র অভিহিত করে অব্যাহত প্রচার চালিয়ে আসা হয়। ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সফর উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সরকার 'Democracy versus Religious Fundamentalism' নামে একটি বই প্রকাশ করে। এতে বিএনপির সাথে তালেবানদের সম্পর্ক এবং বাংলাদেশে তালেবানরা সক্রিয় থাকার কথা বলা হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হবার পর আওয়ামী মহলের এই প্রচারণা তুঙ্গে উঠে। তারা কলকাতা, লন্ডন, প্যারিস, ব্রাসেলস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে সংঘবদ্ধ ও অব্যাহত অপপ্রচার চালায় বাংলাদেশের

বিরুদ্ধে। এই অপপ্রচারের মূল কথা ছিল, বাংলাদেশ জঙ্গি মুসলমানদের দেশ। এদেশ তালেবান ও আল-কায়েদাদের চারণভূমি। বাংলাদেশে মানবাধিকার বলতে কিছু নেই। এদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কচুকাটা করা হচ্ছে, উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সম্ভ্রম কেড়ে নেয়া হচ্ছে নারীদের আর তাদের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে দেশ। একটা অদৃশ্য শক্তির ব্যবস্থাপনায় এই অপপ্রচারে অংশ নেন বৃটেনের চ্যানেল-৪ টেলিভিশন, টাইমস ম্যাগাজিন, ফারইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ এবং আওয়ামী লীগও। যারা ইকনমিক রিভিউতে বার্টিল লিন্টনারের রিপোর্ট 'Bangladesh: A cocoon of Terror,' টাইম ম্যাগাজিনে আলেক্স পেরীর 'Deadly cargo' চ্যানেল-৪ এর জাইবা মালিক ও লিও পোল্ড-এর সাজানো রিপোর্ট তৈরির কাহিনী এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের 'বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ২০০১' ও বাংলাদেশ প্রোটেইট অব কভার্ট জেনোসাইড' পড়েছেন, তারা জানেন, এই অপপ্রচার কত জঘন্য, কত ষড়যন্ত্রমূলক। হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের 'বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ২০০১' শীর্ষক ১৫৬ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিনে যে প্রচ্ছদ আঁকা হয়েছে তাতেই পরিষ্কার বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে তারা কি জঘন্য দৃষ্টিতে দেখে। প্রচ্ছদে উপরের এক পাশে একটি ধর্ষিতা হিন্দু মেয়ের ছবি এবং ডানপাশে এক বৌদ্ধের মৃতদেহ। প্রচ্ছদের ঠিক মাঝখানে দাড়ি-টুপিসহ কয়েকজন বাংলাদেশী মুসলিমের ছবি এবং নিচে লিখা রয়েছে 'বি অয়ার অব বাংলাদেশ (বাংলাদেশের ব্যাপারে সাবধান)। এর বামে লেখা রয়েছে 'এ কুকুন অব টেরর (সন্ত্রাসের আবাসস্থল)। প্রচ্ছদের নিচের অংশে রয়েছে একটা মিছিলের ছবি যার মাঝখানে লাদেনের ছবি জুড়ে দিয়ে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে 'প্রো-বিন লাদেন র‍্যালি ইন ঢাকা।' এই প্রচ্ছদে বাংলাদেশের এমন ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যার দাবি ছিল আমেরিকা ঠিক আফগানিস্তানের মত বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু তা হয়নি। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যেমন সে সময় বাংলাদেশকে 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট বুশও তাই বলছেন।

এই পরিস্থিতিতেই অজানা-অচেনা জামায়াতুল মুজাহেদীনের আবির্ভাব এবং একই দিনে একই সময়ে বাংলাদেশ জুড়ে প্রায় ৫শ বোমার বিস্ফোরণ। বলা যায়, বাংলাদেশ বিরোধী সব প্রচার ব্যর্থ হবার পর খোদ ষড়যন্ত্রকারীরাই বাংলাদেশে তালেবানী কর্মকাণ্ড শুরু করেছে, যাতে হাতে-কলমে তাদের এতদিন ধরে তোলা অভিযোগের প্রমাণ হাজির করা যায় বিশ্ববাসীর কাছে। এইসব অপ-প্রচারের বেনিফিসিয়ারী ছিল আওয়ামী লীগ এবং তাদের মিত্রশক্তি। কারণ, সরকারকে বিব্রত করতে পারাতেই ছিল আওয়ামী লীগের লাভ, সরকারকে দুর্বল করতে পারায় ছিল আওয়ামী লীগের লাভ, জোট ভাঙতে পারাতেও ছিল আওয়ামী লীগের লাভ এবং 'মৌলবাদী' সন্ত্রাসী 'জিহাদী নামের মোড়কে বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দল, আলেম-ওলামা, মাদরাসা-মক্তব ইত্যাদি যদি নির্মূল করা যায়, কমপক্ষে যদি মাটিতে শুইয়ে দেয়া যায়, তাহলে আওয়ামী লীগ ও তাদের

মিত্রশক্তি উভয়েরই মহালাভ। তাদের এই মহালাভের বলি ছিল কিছু অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত ও বেকার কিশোর এবং বিপথগামী ও পুতুল কিছু মানুষ। কম্যুনিস্টরাও একদিন এই 'এজ গ্রুপ'কে টার্গেট করে তাদের সর্বনাশ করেছিল। তবে কম্যুনিস্টদের বিভ্রান্তি কাটতে দেরি হয়েছিল। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে দেরি হয়নি। শীঘ্রই ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে পড়ে যায়।

তাদের প্রায়, হাজারের মত ধরা পড়ে, তাদের আড্ডাসমূহ ধ্বংস হয়, শীর্ষ ৬ জনের ফাঁসিও হয়। অনেকের কারাদণ্ড হয়। এদের মতই সুমন চক্রবর্তী সিএনএন'দের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন। এরাই আল কায়দা, জেএমবি, হুজির স্রষ্টা। এরাই কোটি কোটি টাকা খরচ করে দুনিয়াব্যাপী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। জনগণ তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে। সত্যের ধারক জনগণের কাছে মিথ্যার পরাজয় ঘটেছে। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, "I am a firm believer the people. If given the truth, they can be depended upon to acer any national crisis. The great point is to bring the real fact." 'অর্থাৎ আমি জনগণে বিশ্বাসী। যদি সত্য তাদের জানানো হয়, তাহলে যে কোন সংকট মোকাবিলায় তাদের উপর নির্ভর করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আসল ঘটনা তাদের জানতে হবে। আব্রাহাম লিংকন যেটা বলেছেন, জনগণকে আস্থায় নেয়ার সেই কাজটা কিন্তু আমাদের মত দেশে কম হয়। ছোট দেশগুলো নানা কারণে অনেক কথা প্রকাশ করেনা, করতে পারে না, এটা একটা বড় সত্য। কিন্তু অস্তিত্বেই যখন আঘাত এসে যায়, তখন কোন কিছুকে আর ভয় করার, সমীহ করার অবকাশ থাকে না। মনে হয় আমরা সে অবস্থায় পৌঁছে গেছি। সব প্রকাশ করে জাতিকে আস্থায় নেয়া এখন উচিত। Edmund Burks-এর একটা বিখ্যাত উক্তি: The pepole never give their liberties, but under some elusion অর্থাৎ একমাত্র চরম বিভ্রান্তির মধ্যেই কেবল জনগণ তাদের স্বাধীনতা পরিত্যাগ করতে পারে। সত্য জানার অভাবেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সত্য গোপন করে ও মিথ্যাচার চালিয়ে সুমন চক্রবর্তী ও CNN-রা আমাদের জনগণের মধ্যে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি।

জিহাদ নিয়ে তাদের অপ-প্রচার এখনও জারি থাকলেও তার সে গতি মুখ থুবড়ে পাড়ছে। 'ওয়ার অন টেরর' থেমে গেছে।। ইসলামের 'জিহাদ'কে 'সন্ত্রাস' সাজাবার প্রয়াশও ঐ একই ভাগ্য বরণ করেছে। অপপ্রচারকারীরা বিশ্বব্যাপী যে প্রচার করেছে, সবার মধ্যে যে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়েছে এবং ইসলামকে জানতে পড়তে মানুষকে বাধ্য করেছে, তারই ফল এটা। শুধু কিছু মুসলিম রাজীনিতক ও কিছু বুদ্ধিজীবির আক্কেল এখনও হয়নি। ■

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশের তারতম্য: একটি পর্যালোচনা

ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

৫ আগষ্ট ২০২৪ এর বিপ্লবের পর দেশে এখন বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কার কার্যক্রম চলছে। এগুলোর মধ্যে নারী বিষয়ক সংস্কার অন্যতম। সরকার এ জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে এবং তারা সংস্কারের কিছু সুপারিশও পেশ করেছে। তাদের সুপারিশকৃত সংস্কার প্রস্তাব চরম বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কারণ এ ক্ষেত্রের প্রায় সকল সুপারিশ ইসলামের সরাসরি বিপক্ষে গিয়েছে। সরকার যে কমিটি গঠন করেছে, তার সদস্যরা প্রায় সকলেই ইসলামের বিপরীত চিন্তার অধিকারী। এ জন্য বিভিন্ন মহল থেকে এ কমিটির সংস্কারের দাবী উঠেছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯০% ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠী। বাস্তব জীবনে ইসলাম পালনে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তারা ইসলামী চিন্তার ধারক। উদ্ভট চিন্তার বিচ্ছিন্ন কিছু নারী-পুরুষ রয়েছে, কিন্তু তাদের উচ্ছৃখল চিন্তার সাথে এ দেশের আম জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং নারী সংস্কার কমিটির পেশকৃত ইসলাম বিরোধী প্রস্তাবণা গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। তাই এ কমিটি বাতিল করে এ দেশের সাধারণ জনগণের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে অনুকূল চিন্তার অধিকারী লোকদের দিয়ে সংস্কার কমিটি গঠন করতে হবে।

এ কমিটি যে সকল সুপারিশ পেশ করেছে, তার সবগুলো এখানে আলোচনা করবো না। এখানে শুধু একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তা হলো উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অংশ প্রদানের সুপারিশ।

সংস্কার কমিটির এ প্রস্তাবনা আলকুরআন তথা আল্লাহর বিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক ছেলে দু'মেয়ের সমান অংশ পাবে।” (৪, সূরা আন্‌নিসা : ১১) প্রকৃত অবস্থা না বুঝেই অনেক জড়বুদ্ধির লোক অভিযোগ করেন যে, এ ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এ জন্য বিষয়টি পর্যালোচনার দাবী রাখে। এ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে এটা জানা জরুরী যে, ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের অবস্থা কি ছিল এবং ইসলাম নারীদেরকে সে অবস্থা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে।

জাহেলী যুগে নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না, ছিল না অর্থনৈতিক কোন অধিকার। বরং সে যুগে নারীদেরকেই ভোগ্যপণ্য হিসেবে গণ্য করা হতো। মৃত স্বামী, পিতা-মাতা বা অন্য কোনো আত্মীয়ের রেখে যাওয়া সম্পদে নারীদের কোনো অধিকার

স্বীকৃত ছিল না। অধিকন্তু তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে জবরদখল করে ভোগ করতো। অর্থনৈতিক কারণে নারীদের প্রতি যে নিবর্তনমূলক আচরণ করা হতো, তার প্রতিকারার্থে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

"হে ঈমানদারগণ! জবরদস্তিভাবে নারীদের উত্তরাধিকারী হতে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল হতে পারে না, আর স্ত্রীদেরকে যা কিছু প্রদান করেছ, তার কতকাংশ ফিরিয়ে নেওয়ার মতলবে তাদেরকে আটকিয়ে রেখো না, যতক্ষণ না তারা প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ।"[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি বলেন,

"আলোচ্য আয়াতে সেসব নির্যাতন প্রতিরোধ করা হয়েছে, যেগুলো ইসলামপূর্বকালে নারীদের প্রতি নিতান্ত সাধারণ আচরণ বলে মনে করা হতো। তন্মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ নির্যাতন ছিল এই যে, পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করতো। যে স্ত্রী তার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানা মনে করতো।" তিনি আরো বলেন,'এই একটি মাত্র মৌলিক ভ্রান্তির ফলশ্রুতিতে নারীদের উপর নানা ধরণের নির্যাতন চলতো। যেমন,

১. যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে অথবা অন্য কোনোভাবে লাভ করতো, সেগুলোকে হজম করে ফেলা হতো।
২. যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিতো, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত, যাতে ধন-সম্পদ বাইরে নিয়ে যেতে না পারে, বরং এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়।
৩. মাঝে মাঝে স্ত্রীর কোন দোষ না থাকা সত্বেও শুধু স্বভাবগত কারণে স্বামী তাকে অপছন্দ করতো এবং স্ত্রীর প্রাপ্য প্রদান করতো না। অপরপক্ষে তালাক দিয়ে তাকে মুক্তও করতো না, যাতে সে অতিষ্ট হয়ে অলংকার ও মোহরানা বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরৎ দেয় কিংবা অপ্রদত্ত মোহরানা ক্ষমা করে দেয়। মাঝে মাঝে স্বামী তালাক দিয়েও তালাক প্রাপ্তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না, যাতে সে বাধ্য হয়ে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দেয় কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা ক্ষমা করে দেয়।
৪. কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিসরা বিধবাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতোনা মূর্খতা প্রসূত লজ্জার কারণে কিংবা অর্থ আদায় করার লোভে। এসব নির্যাতনের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা নিজেদেরকে স্ত্রীর সম্পত্তির এমনকি তার প্রাণেরও মালিক মনে করতো। কুরআন পাক এসব অনর্থের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে এবং এর আওতায় সংঘটিত নির্যাতনসমূহের প্রতিকারকল্পে ঘোষণা

১. ৪-সূরা আন-নিসা : ১৯-২১।

করেছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে বস।"[২]

প্রাচীন যুগে বিভিন্ন ধর্মে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা :

প্রাচীনকালে উপার্জনের মাধ্যমে নারীকে মালিকানা লাভের সুযোগই দেওয়া হতো না। কোনক্রমে যদি কোন নারী ধন-সম্পদের মালিক হতো, তাহলে তা ছলে-বলে-কৌশলে পুরুষরাই ভোগ-দখল করত। এক্ষেত্রে কোন নারী বাধা দিলে তার উপর নেমে আসতো নানাবিধ নির্যাতন।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও নারীদের কোন অংশীদারিত্ব ছিল না। সে যুগে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে শুধুমাত্র পুরুষদের উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

এ ব্যাপারে বাইবেলিকায় বলা হয়েছে,

In harmony with the unanimous view of the ancient world, only the adult free male member of the community capable therefore of bearing arms and carrying out blood revenge were regarded as invested with full legal rights.

The right of inheritance among the Israelites belong only to agnates....Only sons, not daughters, stil less wifes, can inherit.

"প্রাচীন কালে জগতের সর্বসম্মত সাধারণ নিয়মানুসারে, গোত্রের অস্ত্র ধারণক্ষম এবং রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাধীন পুরুষ সদস্যগণই কেবল মাত্র আইনের অধিকার লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হত।" "ইহুদীদের মধ্যে উত্তরাধিকারের অধিকার শুধুমাত্র পিতৃকূলের আত্মীয়রাই পেত।" "ইহুদী সমাজে উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী ছিল কেবল পুত্ররা, কন্যাদের তাতে কোন অধিকার ছিলনা, আর স্ত্রীদেরও ছিলনা কোন অধিকার।"[৩]

বাইবেলে বলা হয়েছে, পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র। বাইবেলের পরিভাষায় একে 'জ্যেষ্ঠাধিকার' বলা হয়। বাইবেলে বলা হয়েছে, "যদি কোন পুরুষের প্রিয়া অপ্রিয়া দুই স্ত্রী থাকে এবং প্রিয়া অপ্রিয়া উভয়ে তার জন্য পুত্র প্রসব করে, আর জ্যেষ্ঠ পুত্র অপ্রিয়ার সন্তান হয়, তবে আপন পুত্রদিগকে সর্বস্বের অধিকার দিবার সময়ে অপ্রিয়জাত জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকিতে সে প্রিয়জাত পুত্রকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারিবে না। কিন্তু সে অপ্রিয়ার পুত্রকে জ্যেষ্ঠরূপে স্বীকার করিয়া আপন সর্বস্বের দুই অংশ তাহাকে দিবে; কারণ সে তাহার শক্তির প্রথম ফল, জ্যেষ্ঠাধিকার তাহারই।"[৪]

ভারতবর্ষে হিন্দুশাস্ত্র নারীদের সামাজিক, আর্থিক বা ধর্মীয় কোন অধিকারই প্রদান

২. মা'আরিফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা তাফসীর, ২৪০ পৃ.।
৩. মাওলানা আকরাম খান, প্রাগুক্ত, বাইবেলিকা, ল জাষ্টিস এর উদ্ধৃতিতে।
৪. দ্বিতীয় বিবরণ : ২১-১৫,১৬।

করেনি। নারীর স্বত্ব ও অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। মণি-ঋষিরা ব্যবস্থা দেন যে, "তপজপ, তীর্থযাত্রা, সন্যাস গ্রহণ, দেবতার পুজা-আরাধনা প্রভৃতি ধর্ম কর্মে 'স্ত্রী শূদ্রাদির' কোন প্রকার অধিকার থাকিবে না।" তারা আরো বিধান দেন যে, "কোন শূদ্র বা নারী ঐশিক বাণী শ্রবণ-উচ্চারণরূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইলে রাজা অবিলম্বে তাহার প্রাণ বধ করিবেন।"[৫]

স্বয়ং ভগবান মনু নারী সম্পর্কে বলেন, "যেহেতু মন্ত্র দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের জাতকর্মাদি সংস্কার হয়না, এ জন্য উহাদিগের অন্তঃকরণ নির্মল হইতে পারে না এবং যেহেতু বেদ স্মৃতিতে তাহাদের কোন অধিকার নাই, এজন্য তাহারা ধর্মজ্ঞও হইতে পারেনা। এবং পাপ করিয়া কোন মন্ত্রের আবৃত্তির দ্বারা যে তাহার স্খালন করিয়া লইবে, সে সুযোগও তাহাদের নাই, কারণ কোন মন্ত্রে তাহাদের অধিকার নাই।"[৬]

হিন্দুশাস্ত্র নারীকে এক প্রকার বাইরে রেখেই সম্পত্তি বন্টনের ব্যবস্থা করেছে।

ইসলামের প্রতিকার :

ইসলাম এ সকল অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিকার পূর্বক নারীদের আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিতের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ধন-সম্পদ উপার্জন ও তার মালিক হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"আল্লাহ তোমাদের কতককে কতকের উপর যে মর্যাদা দিয়েছেন, তার আকাংখী হয়োনা। পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে যা তারা উপার্জন করেছে তাতে, আর নারীদের জন্যও অংশ রয়েছে যা তারা উপার্জন করেছে তাতে। আর তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[৭]

ইসলাম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও পুরুষের ন্যায় নারীদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে জাহেলী যুগে নারীদের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করা হতো। তাদেরকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হতে কোন অংশই দেয়া হতো না। ফলে কোন ব্যক্তি স্ত্রী-কন্যা রেখে মারা গেলে তাদেরকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হতো। হাদীছে বর্ণিত আছে, আউস ইবন ছাবিত (রা.) স্ত্রী, দুই কন্যা ও একটি নাবালেগ পুত্র রেখে মুত্যুবরণ করেন। প্রাচীন আরবীয় প্রথা অনুযায়ী তার দুই চাচাত ভাই এসে তার সম্পত্তি দখল করে নিল এবং স্ত্রী ও সন্তানদেরকে কিছুই দিল না। আউস ইবন ছাবিত (রা.) এর স্ত্রী চাচাত ভাইদ্বয়কে তার কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে তারা তাও অস্বীকার করল। তখন তিনি তার সন্তানদের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনার করুণ অবস্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করলেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন,

---

৫. মাওলানা আকরাম খাঁ, মোস্তফা চরিত, পৃ.২০৭, অত্রি সংহিতা, ১৯ ও ১৩৫ এর উদ্ধৃতিতে।
৬. প্রাগুক্ত, মনুসংহিতা, ৯ম অধ্যায়ের উদ্ধৃতিতে।
৭. ৪-সূরা আন-নিসা : ৩১।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজন যা কিছু রেখে (মৃত্যুবরণ করে,) তাতে পুরুষদের অংশ রয়েছে। অনুরূপভাবে পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে নারীদেরও অংশ আছে, কম বেশি যাই হোক, এ অংশ নির্ধারিত।"[৮]

মীরাছ বা উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এটাই কুরআনের প্রথম আয়াত। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যে অনাচার ও অন্যায় প্রথা প্রচলিত ছিল, এ আয়াতে তার প্রতিকার করা হয়েছে এবং উত্তরাধিকার বন্টনের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে,

১. সম্পত্তির মালিক যেমন পিতা হতে পারে, মাতাও তেমনি নিজ স্বত্বে তার মালিক হতে পারে।

২. পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজন যেসব সম্পত্তি রেখে মুত্যুবরণ করে, তার ওয়ারিছ হওয়ার অধিকার যেমন পুরুষদের রয়েছে, নারীদেরও ঠিক সেরূপ অধিকার আছে।

এ অধিকার হতে স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগ্নী প্রভৃতি নারীদেরকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলেও কোন প্রভেদ করা হয়নি। উল্লেখিত আয়াতে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আর তা হলো নারী ও পুরুষের অধিকার সম্বন্ধে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধারার সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নারীদের উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ এবং পুরুষদের উপর কোন প্রকারে নির্ভরশীল নয়।

এরপর সুরা নিসার ১১, ১২ এবং ১৭৬ নং আয়াতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী কোন কোন ব্যক্তি হবে এবং কার অংশ কি পরিমাণ, তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পিতার সম্পত্তিতে ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামীকে স্ত্রীর দ্বিগুণ দেওয়া হয়েছে। সকল উত্তরাধিরীর অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৯]

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদ-নদীসমূহ

৮. ৪-সূরা আন-নিসা : ৭।
৯. ৪-সূরা আন-নিসা : ১১।

প্রবাহিত। সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরস্থায়ীভাবে, আর এটাই হলো মহা সাফল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়ে চলবে এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখাগুলোকে লংঘন করবে, তাকে প্রবিষ্ট করাবেন জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডে, যেখানে সে হবে চিরস্থায়ী এবং তার জন্য (সেখানে) রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।”[১০]

সুতরাং উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন,স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি সকলের জন্যই আল্লাহ তা'আলা স্ব-স্ব অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এ নির্ধারণ আল্লাহ তা'আলার অলংঘনীয় বিধান। এর ব্যত্যয় ঘটানো বা অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি করা অথবা কাউকে বাদ দেয়ার কোন অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। যদি কেউ এমনটি করে, তাহলে সে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য, সীমালংঘনকারী, জালিম ও কঠিন দন্ডযোগ্য অপরাধী। সুতরাং যারা আল কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য, সীমালংঘনকারী জালিম ও দণ্ডযোগ্য অপরাধী।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশের তারতম্যের কারণ :

অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে, ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদেরকে ঠকিয়েছে। কারণ, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের অংশ পুরুষের অর্ধেক দেয়া হয়েছে। যেমন ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ এবং স্বামীকে স্ত্রীর দ্বিগুণ অংশ দেয়া হয়েছে। জেনে রাখা আবশ্যক যে, এটা নারীদের প্রতি কোন অবিচার নয়, বরং এটিই সামাজিক সুবিচার ও ইনসাফের দাবী। আর ইসলাম যেহেতু মানুষকে সুবিচার ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছে, সেহেতু ইনসাফের দাবীকে সে উপেক্ষা করতে পারেনা।

সকল ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের অংশের কম-বেশি করা হয়নি, বরং ক্ষেত্র বিশেষে নারী-পুরুষের অংশ সমানও দেওয়া হয়েছে। যেমন মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার রেখে যাওয়া সম্পদে পিতা এবং মাতা উভয়েরই অংশ সমান অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ দেওয়া হয়েছে। আবার বৈপিতৃয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণকেও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অংশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেখানে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ অংশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ছেলে, ভাই এবং স্বামীকে মেয়ে, বোন ও স্ত্রীর দ্বিগুণ দেওয়া হয়েছে, অবশ্যই সেটা ন্যায় সঙ্গত ও যৌক্তিকভাবেই দেওয়া হয়েছে। কারণ,

১. পিতার সংসারের আয়-উপার্জনে পিতার সঙ্গে ছেলেরা শ্রম দিয়ে থাকে। কৃষিকাজ, ব্যবসা বা অন্য কোনভাবে ছেলেরাও প্রত্যক্ষভাবে পিতার সম্পদ অর্জনে সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু মেয়েরা পিতার সম্পদ অর্জনে প্রত্যক্ষভাবে তেমন কোন ভূমিকা পালন করেনা। শ্রম দিয়ে যারা পিতার সম্পদ অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে, পিতার রেখে যাওয়া সম্পদে তাদের অংশ বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ পিতার সম্পদে তাদের উপার্জিত সম্পদও রয়েছে।

২. পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়, তখন তাদের দেখাশুনা ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছেলেদেরকেই বহন করতে হয়। মেয়েদেরকে এর কোন দায়-দায়িত্ব বহন

১০. ৪-সূরা আন-নিসা : ১৩-১৪।

করতে হয়না। পিতা-মাতার ব্যয়ভার যাদেরকে বহন করতে হয়, তাদেরকে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে বেশি প্রদান করাই ইনসাফের দাবী।

৩. বিবাহের পূর্বে মেয়েদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করেন পিতা, দাদা, ভাই বা চাচা। আর বিবাহের পর তার ভরণপোষণ করে থাকেন স্বামী। কিন্তু ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিজেরা উপার্জন করে জীবন যাপন করে এবং বিবাহ করে নিজের ভরণপোষণের পাশপাশি স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্যদেরও ভরনপোষণ করে থাকেন। এমতাবস্থায় কোন্ বিবেকবান ব্যক্তি একথা বলতে পারে যে, এ উভয়ের অংশ সমান হওয়া উচিৎ?

৪. একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়। বিবাহের সময় ছেলেকে আবশ্যিকভাবে স্ত্রীকে একটি বিশেষ অংক মোহরানা হিসেবে প্রদান করতে হয়। কিন্তু মেয়েকে এ ক্ষেত্রে কিছুই ব্যয় করতে হয়না। ধরুন পিতার সম্পদ হতে ছেলে দ্বিগুণ হিসেবে ৪০০০/- টাকা পেল, আর মেয়ে পেল তার অর্ধেক ২০০০/- টাকা। বিবাহের সময় ছেলে তার প্রাপ্ত অংশ থেকে স্ত্রীর মোহরানা হিসেবে ২০০০/- টাকা প্রদান করল। ফলে তার অবশিষ্ট থাকল ২০০০/- টাকা। অপরদিকে মেয়ে বিয়ের সময় মোহরানা হিসেবে স্বামীর নিকট হতে ২০০০/-টাকা পেল। এখন দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ছেলের সম্পদ কমে ৪০০০/- টাকা থেকে ২০০০/- টাকা হয়েছে। পক্ষান্তরে মেয়ের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ২০০০/ টাকার সঙ্গে মোহরানার ২০০০/- টাকা যোগ হয়ে ৪০০০/- টাকায় উন্নীত হয়েছে।

৫. স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ স্বামীর সম্পদ থাকে বেশি এবং স্ত্রীর সম্পদ থাকে কম। ফলে স্বামী স্ত্রীর দ্বিগুণ অংশ পাওয়া স্বত্ত্বেও স্ত্রীর সম্পদ হতে যা পায়, স্ত্রী স্বামীর অর্ধেক অংশ পাওয়ার পরও স্বামীর সম্পদ হতে স্ত্রীর প্রাপ্ত অংশ হয়ত স্বামীর প্রাপ্ত অংশের সমান বা কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। শুধু অংশ হিসেবে দ্বিগুণ বা অর্ধেক পাওয়ার দিকটি দেখলেই হবেনা, প্রকৃতপক্ষে কে কি পরিমাণ সম্পদ পেল সেটাও দেখার বিষয়। অধিকন্তু স্ত্রী দু'দিক থেকে সম্পদের অংশ পেয়ে থাকে। এক. পিতা-মাতার সম্পদ হতে এবং দুই. স্বামীর সম্পদ হতে।

৬. মানব সমাজে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়-দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত। আর এ দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এবং দুটি কারণে। এক, স্বভাবগত সামর্থ ও মর্যাদার কারণে দুই, সংসারের সকল ব্যয়ভার বহনের দায়িত্বের কারণে। এ প্রসঙ্গে কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"পুরুষরা হচ্ছে নারীদের রক্ষণাবেক্ষণকারী; আল্লাহ মানব সমাজের কতককে অন্য কতকের উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তার কারণে এবং তারা তাদের সম্পদ হতে যে ব্যয়ভার বহণ করে থাকে তার কারণে।"[১১]

---

১১. ৪-সূরা আন-নিসা : ৩৪।

আদিকাল থেকেই মানব সমাজে এ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত। এ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পুরুষকে এর সার্বিক ব্যয়ভারও বহন করতে হয়। স্ত্রীসহ পরিবারের সকলের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা, খাবার ও পোষাকের ব্যবস্থা করা, কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, আত্মীয় ও অতিথিবৃন্দের আপ্যায়ন ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা, ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার ব্যয়ভার বহন করাসহ সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে হয় পুরুষকে। এ সকল ক্ষেত্রে নারীদেরকে কোন দায়িত্বই দেয়া হয়নি। এর ফলে নারীর সম্পদ হ্রাস না পেয়ে সঞ্চিত থাকে অথবা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে পুরুষের সম্পদ হতে প্রতিনিয়ত একটি বড় অংশ ব্যয় হয়ে যায়। ব্যয় নির্বাহের সকল দায়িত্ব পুরুষের ঘাড়ে চাঁপিয়ে দিয়ে উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে যদি নারী ও পুরুষকে সমান অংশ দেয়া হতো, তাহলে সেটা হতো চরম অন্যায়মূলক ব্যবস্থা। ন্যায়ের ধর্ম ইসলাম এ ধরনের অন্যায় ব্যবস্থা কখনই সমর্থন করতে পারেনা।

এ সকল বিষয় সামনে না থাকলে শুধু অংশের তারতম্যের কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে, যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে সংস্কার কমিটি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা উত্তরাধিকারের বিধান বর্ণনার পর বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে দিচ্ছেন, যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।" (৪, সূরা আন্‌নিসা : ১৭৬)

এ যৌক্তিক বিষয়গুলো মেনে নেওয়া প্রতিটি বিবেকবান মানুষেরই কর্তব্য। অবশ্য যাদের বিবেক মৃত অথবা যারা অবিবেচক, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোনো বিধানই প্রজ্ঞা বিহর্ভুত নয়। অধিকন্তু তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। সৃষ্টির জন্য কোন্ বিধান অধিকতর কল্যাণকর তা তিনিই অধিক অবগত। মানুষ স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে অনেক সময় আল্লাহর কল্যাণকর বিধানের কল্যাণকারীতা উপলব্ধি করতে পারে না। সে জন্য আল্লাহর বিধানকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া ঈমানদারদের কর্তব্য। এভাবে আল্লাহর বিধান মেনে নিতে পারে না যারা, তারা ঈমানদার হতে পারে না। আর যারা ঈমানদার নয়, তারা ঈমানদারদের কোনো বিষয়ের সংস্কার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী নয়। কাজেই নারী সংস্কার কমিটিতে ঈমানদার নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সুতরাং আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার, মুসলিম দেশের মুসলিম নারীদের বিষয়ে সংস্কার করতে হলে ঈমানদার, দ্বীনদার নারীদেরকে দিয়েই করতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে, এদেশে তো অন্য ধর্মের কিছু অধিবাসীও রয়েছে। হ্যাঁ রয়েছে। ইসলামের আলোকে নারী বিষয়ক সংস্কার যদি তাদের ধর্মের বিরোধী হয়, তবে অবশ্যই আমরা তা তাদের উপর চাঁপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতি নই। সেক্ষেত্রে তাদের ধর্মের আলোকে সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট ধর্মের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আলাদা সংস্কার কমিটি করা যেতে পারে। কিন্তু নানাবিধ কুমতলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর ইসলাম বিরোধী সংস্কার চাপিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই সংগত হবে না এবং এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী তা মেনেও নেবে না। সরকারকে এসকল বিষয় মাথায় রেখে সংস্কার কমিটির আমূল সংস্কার করতে হবে। ■

সংস্কৃতির ভিত রচনায় তাওহীদ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আব্দুল মান্নান

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজের জনগোষ্ঠী নানা ধরণের সংস্কৃতি লালন করে। কিন্তু কোনো সমাজে নিজে থেকেই কোনো সংস্কৃতি জন্ম নেয় না। সময়ের পরিক্রমায় মানবীয় কিছু মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংস্কৃতির রূপ বিকশিত হয়। মূলতঃ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বস্তুবাদী চিন্তা এই মূল্যবোধ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মূল্যবোধগুলির মধ্যে ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার একক পরিকল্পনায় সৃষ্ট ও একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ধর্মীয় বিশ্বাস হলো অন্যতম। মহান এক পরিকল্পনাকারী বিশেষ উদ্দেশ্যে মহাবিশ্বের সকল কিছু এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, ধর্মীয় এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাথে বস্তুবাদী অথবা ডারউইনের বিবর্তনবাদের মাধ্যমে মানুষের উদ্ভবে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। শুধু তাই নয় সৃষ্টিকর্তাতে বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা একত্ববাদ তথা তাওহীদে বিশ্বাসী তাদের সংস্কৃতি এবং বহু ইশ্বরবাদে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির রূপের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ পরিসরে সকল ধরণের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই শুধুমাত্র একত্ববাদে বিশ্বাসীদের বিশেষ করে ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ কি হতে পারে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা তুলে ধরার প্রয়াশ থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

সংস্কৃতি শব্দের আভিধানিক অর্থ চিৎপ্রকর্ষ (ধর্মীয় সংস্কৃতি) বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। অধিকন্তু সংস্কার, শুদ্ধিকরণ ইত্যাদিও সংস্কৃতির আভিধানিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজি Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বর্তমানে সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আমাদের অনেকের ধারণা সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা ইত্যাদি হচ্ছে সংস্কৃতির মূল কথা। এই সংকীর্ণ চিন্তার বাইরেও এর ব্যাপকতা প্রণিধানযোগ্য। প্রচলিত অর্থে কোনো স্থানের মানুষের পরিচ্ছন্ন জীবন-চেতনা, আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি। বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড বার্নেট টেইলর (Edward Burnett Tylor) তাঁর বই "Primitive Culture" এ সংস্কৃতির' সংজ্ঞা দিয়েছেন এ ভাবে- culture is "that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law,

custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society." 'সংস্কৃতি' হচ্ছে কতগুলো বিষয়ের সংমিশ্রন যার মধ্যে রয়েছে, মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পবোধ, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য সামর্থ্য ও অভ্যাসসমূহ যা সমাজের সদস্য হিসাবে একজন মানুষ অর্জন করে।

উপরের সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের মনে হতে পারে যে, সংস্কৃতি বলতে বুঝায় কোনো জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, শিল্প-কারিগরী, ললিতকলা, সামাজিকরীতি, জীবনপদ্ধতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এগুলো সংস্কৃতির আসল প্রাণবস্তু নয়, তার ফলাফল ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সংস্কৃতি বৃক্ষের মূলও নয়, কাণ্ডও নয়, তার শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব মাত্র। এসব বাহ্যিক লক্ষণ ও খোলসের ভিত্তিতে কোনো সংস্কৃতির মূল্যমান নির্ধারিত করা যায় না। তাই এগুলো বাদ দিয়ে মুসলিমদেরকে সংস্কৃতির প্রাণবস্তু অবধি পৌঁছা এবং এর মূলভিত্তি ও মৌলিক উপাদানগুলো তাওহীদ থেকে উৎসারিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অন্বেষণ করা প্রয়োজন।

তাওহীদ (**توحيد**) অর্থ 'এক করা', 'এক বানানো', 'একত্রে যুক্ত করা', 'একত্রিত করা', 'একীকরণ', 'একত্বের ঘোষণা দেওয়া' বা 'একত্বে বিশ্বাস করা'। তাওহীদ (**توحيد**) শব্দটি আরবি 'ওয়াহাদা' (**وحد**) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ 'এক হওয়া', 'একক হওয়া' বা 'অতুলনীয় হওয়া'। তাওহীদ নামক এ পরিভাষাটি আল্লাহ্র একত্বের ব্যাপারে ব্যবহৃত হলে তা দ্বারা আল্লাহ্র সঙ্গে মানুষের সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্রিয়াকলাপে তাঁর একত্ব উপলব্ধি করা ও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অক্ষুন্ন রাখা বুঝায়, অর্থাৎ যা কিছু আল্লাহ্র জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত সে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একত্ব অখণ্ড রাখা। তাহলে তাওহীদের মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক, তাঁর কর্তৃত্বে ও প্রভুত্বে কোনো শরীক বা অংশীদার নেই, তাঁর জাত, সত্তা ও গুণাবলীতে কোনোই সদৃশ নেই তথা তিনি একক ও অতুলনীয় এবং ইলাহ্রূপে সকল প্রকার 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য হিসেবে তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। উপরন্তু নিম্নে বর্ণিত পবিত্র কুর'আনের আয়াত এবং হাদীস থেকে তাওহীদের সুস্পষ্ট ধারণা আমরা পেতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া 'ইবাদাতের আর কোন হকদার নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই; বিধান তাঁরই; এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।" (সূরা কাসাস ঃ ৭০)

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ-هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ-هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ.

"তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন। তিনিই রহ্মান ও রহীম। আল্লাহ-ই সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি বাদশাহ, অতীব পবিত্র, পূর্ণাঙ্গ শান্তি, নিরাপত্তাদানকারী, হিফাযতকারী, সবার ওপর বিজয়ী, নিজ হুকুম জারি করায় শক্তিমান এবং অহঙ্কারের অধিকারী। আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে পবিত্র যা লোকেরা করে থাকে। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, তা বাস্তবায়নকারী এবং সেই অনুপাতে রূপদানকারী। উত্তম নামসমূহ তাঁর-ই। আসমান ও যমীনের সবকিছু তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করে চলেছে। তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা হাশর ঃ ২২-২৪)

আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের অংশ বিশেষ থেকে আমরা জানতে পারি, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে বান্দাই বলবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আর এটার উপরই মৃত্যুবরণ করবে তাহলে নিশ্চিত সে জান্নাতে যাবে।" (বুখারী)

আমরা যদি উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীসকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি তাহলে তাওহীদের আলোকে আমাদের কর্মের পরিধি নির্ধারণ সহজ হয়ে যাবে। আর একই সাথে সংস্কৃতির মূল ভিত রচনা করার দিগন্ত উন্মচিত হবে।

তাওহীদ এবং এর শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কম-বেশী আমরা সবাই অবহিত। তবে তাওহীদ শব্দটি আল-কুর'আন ও রাসুল (সা.) এর হাদীসের কোথাও সরাসরি উল্লেখিত হয়নি এবং এর শ্রেণীবিভাগ সমূহের সংখ্যার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে তাওহীদের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এবং ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক সংগৃহীত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, রাসুল (সা.) যখন মু'আয ইবনে জাবাল (রা) কে ৯ম হিজরি সনে ইয়েমেনের গভর্ণর হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন তখন তিনি তাঁকে প্রথমেই ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে শুধুমাত্র আল্লাহ্র একত্বের (ইউওয়াহ্হিদুল্লাহ্র) দিকে আহবান জানানো উচিৎ হবে বলে উল্লেখ করেছিলেন।

তাওহীদ শব্দটি এবং এর শ্রেণীবিভাগ কিভাবে এবং কেনো আমাদের মাঝে এলো তাওহীদের আলোকে সংস্কৃতির ভিত রচনার খাতিরেই তার ইতিহাস কিছুটা হলেও জানা দরকার। মিশর, বাইযান্টাইন, পারস্য এবং ভারতে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর এসব এলাকার সংস্কৃতির সাথে তাওহীদের বিষয়গুলি বিলীন হওয়ার ফলে তাওহীদের মৌলিক তত্ত্বসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এসব এলাকার জনগণ যখন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া শুরু করে, তখন তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের ধারণকৃত বিশ্বাসের কিছু অংশ স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে বহন করেছে। নতুন ধর্মান্তরিত তথা নও-মুসলিম এ সব ব্যক্তিগণের মধ্যে থেকে কিছুকিছু ব্যক্তি তাদের লেখায়, কথা-বার্তা এবং বক্তৃতায় সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত বিভিন্ন প্রকারের নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ ইসলামের সঙ্গে জড়িয়ে প্রকাশ করা শুরু করলে বিভ্রান্তি মাথাচাড়া দেয়ে ওঠে। পৃথিবীতে প্রচলিত বাতিল ধর্মমত এবং বিশেষ করে গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের কু প্রভাবে মুসলিমদের ঈমান ও আক্বীদায় বিভ্রান্তির জাল ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, প্রকারান্তরে ইসলামের বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল একত্বের বিশ্বাস

তাওহীদের উপর আক্রমণের সূত্রপাত ঘটে। অন্যদিকে কতিপয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে গোপনে ইসলামকে ধ্বংস করার প্রয়াসে মেতে উঠে। এ দলটি ঈমানের প্রথম ভিত্তি তাওহীদকে ধ্বংস করার মাধ্যমে পুরো ইসলামকেই নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে মুসলিম জনগণের মধ্যে গোপনে গোপনে আল্লাহ্ সম্পর্কে বিকৃত ও ধ্বংসাত্মক মতবাদ প্রচারে লিপ্ত হয়। ফলে ইসলামের অবিমিশ্র মত ও পথের অনুসারী আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের হক্কানী 'উলামায়ে কিরাম তথা প্রকৃত 'আলিমগণ মুসলিমদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে ঐ পরিভাষাগুলির প্রবর্তন করেন। কাজেই তাওহীদের চেতনাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

কোনো একটা জনগোষ্ঠী কোনো স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকলে তাদের মানবীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে সেখানে এক ধরণের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। সেখানকার সংস্কৃতির রূপ কেমন হবে তা ঐ জনগোষ্ঠীর মানুষের দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে ধারণা, জীবনের চরম লক্ষ্য, মৌলিক ধর্মবিশ্বাস (বুনিয়াদী আকিদা) ও চিন্তাধারা, ব্যক্তিপ্রশিক্ষণ এবং সমাজব্যবস্থা এই পাঁচটি মূল উপাদানের উপর নির্ভর করে। উল্লেখিত মৌলিক উপাদানগুলিতে তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রভাব পড়লে এক উন্নতমানের সংস্কৃতির সৃষ্টি হতে বাধ্য।

অনেকে বলেন তাওহীদে বিশ্বাসীগণের অর্থাৎ মুসলিমদের আলাদা কোনো সংস্কৃতি নেই এবং থাকতে পারেনা। তাঁদের মতে, যে এলাকাতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাস, সেখানকার সংস্কৃতিই তাঁরা ধারণ করেন। তাঁদের এ ধারণা মোটেও ঠিক না। ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা তাওহীদের মূলনীতিকে বেঁধে ফেলা যায়না। মুসলিম জনগোষ্ঠী যে এলাকাতেই বাস করুননা কেনো, তাওহীদ নির্ভর সংস্কৃতিই মূলতঃ তাঁদের সংস্কৃতি। মুসলিমদের এ উপলব্ধি যতই প্রখর হবে, তাঁদের সংস্কৃতি ততটাই তাওহীদ নির্ভর হবে। একই সাথে ঈমানের দাবি হিসাবেও তাওহীদ ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য তাঁদেরকে মনোযোগী হতে হবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের অধিকাংশের মধ্যে তাওহীদের ধারণা খুবই সীমিত। ফলে আল-কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক কিছুকেই সাবলীলভাবে গ্রহণ করি এবং একটি বারের জন্য আমাদের মনেও হয়না যে আমরা তাওহীদ বিরোধী শিরকের ন্যায় মহা অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ছি।

আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর আদেশ মূলতঃ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই। যেহেতু আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবিই হচ্ছে সংস্কৃতি, সেহেতু আমাদের সংস্কৃতিতে তাওহীদের ছাপ থাকা আবশ্যক।

উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে সংস্কৃতির পাঁচটি মূল উপাদান এবং সংস্কৃতি বিনির্মাণে শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গী কি তার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতি ঐ পাঁচটি মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রনেই সৃষ্টি। বলাবাহুল্য, তাওহীদের আলোকে সৃষ্ট সংস্কৃতির উপাদানগুলিও তাই। সকল সংস্কৃতির মূল উপাদান এক হলেও ভিন্ন আক্বীদা-

বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার কারণে এগুলির প্রকাশও ঘটে ভিন্নভাবে। আবার এক সংস্কৃতির সাথে অন্য সংস্কৃতির কোনো কোনো বিষয়ের মিল এবং অমিল উভয়ই থাকতে পারে।

মুসলিমদের আনুষ্ঠানিক ইবাদত, সামাজিক বিধান, পারিবারিক আচরণ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক নীতিমালা সহ অন্যান্য সকল বিধিবিধান আবর্তিত ও অর্থপূর্ণ হয় একটি মূল ধারণাকে কেন্দ্র করে। আর তা হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রতিটি দিকের বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানদাতা মহান আল্লাহর তাওহীদের ধারণা। বর্তমানে মুসলিম সমাজ তাওহীদের দর্শনকে সঠিকভাবে ধারণ করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। একই সাথে বিজ্ঞান, সাহিত্য, বিজাতীয় দর্শন এবং অন্যান্য ধর্মের প্রভাব বলয়ে আবদ্ধ হয়ে তাওহীদ বিরোধী সংস্কৃতির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। উল্লেখ্য আমাদের সার্বিক কর্মের যেখানেই তাওহীদের মূলনীতির বিচ্যুতি ঘটবে সেখানেই আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক বা অংশীদারীত্ব সৃষ্টি হবে। সুতরাং মুসলিমগণের কর্তব্য হলো শিরকের মায়াজালে আকৃষ্ট না হয়ে তাওহীদের মূলনীতিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা।

এই দর্শনের আলোকে সংস্কৃতি গড়তে হলে অথবা প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করতে হলে প্রথমে যা দরকার তা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিতে কোন পথে শিরক অথবা আকিদা পরিপন্থী চিন্তার এবং কর্মকাণ্ডের অনুপ্রবেশ ঘটছে তা নির্ণয় করা। এ মর্মে নিম্নে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলোঃ

শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ। বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা এমন একটি কাজ বা অভিজ্ঞতা যা কোনো ব্যক্তির মন, চরিত্র অথবা শারীরিক ক্ষমতার উপর একটি গঠনমূলক প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগকেও গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে। আধুনিকতা ও অসাম্প্রদায়িতার ধুয়া তুলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এতটাই নাজুক করে ফেলা হয়েছে যে, তাওহীদের মূল নীতির সাথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অনেক কিছুই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অপর পক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে অন্য ধারার আরো একটি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু থাকলেও বাস্তব কিছু কারণে তা আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদের আলোকে সকল প্রকার জ্ঞান দান এবং প্রয়োগের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারছেনা। সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঈমান-আকিদার দৃষ্টিতে ঢেলে সাজাতে হবে। বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে আপামর জনতা এবং শিক্ষিত মহলকেও বুঝাতে হবে আধুনিকতার অর্থ যদি বেহায়াপনা বা অনৈতিকতা না হয় তাহলে তাওহীদের সাথে এর কোনো বিরোধ নেই। যতদিন পর্যন্ত আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আনতে না পারব ততদিন নিজেদের ঈমান-আকিদা রক্ষার জন্য আমাদেরকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা সামষ্টিকভাবে তাওহীদ ভিত্তিক জ্ঞানার্জন এবং বিতরনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রচেষ্টা সংস্কৃতি বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আবহমানকাল থেকে আমাদের সমাজে রীতি অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সংস্কৃতি চালু আছে। কিছু লোক ওরশ মোবারক, কবর পূজা, মিলাদ মাহ্‌ফিল ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে শিরক ও বিদায়াতের সংস্কৃতির চর্চা চালু রেখেছে। তার সাথে

যোগ হয়েছে 'ধর্ম যারযার উৎসব সবার' তত্ত্ব। এ তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাওহীদের খেলাপ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। নিজনিজ ধর্ম সবাই পালন করবে, এতে কোনো বাধা নেই। তাই বলে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে আকিদা পরিপন্থী কাজ কোনোভাবেই কাম্য হতে পারেনা।

কোনো দিবসের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলীর ব্যাপারে করণীয় কি, সে ব্যাপারে ইসলামের সুন্দর দিক নির্দেশনা থাকলেও, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দিবস বিশেষ করে পহেলা বৈশাখ ও ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনে আমাদের দেশের সংস্কৃতি এতটাই কলুষিত যে, তাওহীদবাদী হিসাবে পরিচিত সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশে এটা কল্পনাও করা যায়না। এগুলির সাথে আরো যোগ হয়েছে জন্ম দিন পালন, ভালোবাসা দিবস, বিয়ে-শাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বিধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব। নাটক, চলচ্চিত্র এবং আকাশ সংস্কৃতির অনেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও তাওহীদের চিন্তা থেকে মুলমানগণ দূরে চলে যাচ্ছেন।

প্রতিকৃতি, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এগুলো স্থাপন করা, এগুলোকে সম্মান করা, এগুলোর উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের মশাল প্রজ্জ্বলন, অমুসলিমদের অনুকরণে কোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুবাদী চেতনা দ্বারা আকৃষ্ট এবং ইসলামী আকিদা থেকে বিচ্যুত মানুষেরা আকিদা বিরোধী বিভিন্ন কর্ম-কান্ডের মাধ্যমে একত্ববাদের মূলে আঘাত হানে এবং এদের মধ্যে থেকে কেউ প্রকাশ্যে আবার কেউ ছদ্মবেশী রূপ ধারণ করে তা করে। উল্লেখ্য আমাদের সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতির অনেক কিছু সংস্কারযোগ্য হলেও অবশিষ্টগুলি পরিত্যাজ্য। তাই ভ্রান্ত চিন্তা ও আকিদা থেকে আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য মুসলিমগণ তাওহীদের মূল বাণী কালেমা তাইয়্যেবা পড়ার মধ্য দিয়ে কি স্বীকার করে নেন তা হৃদয়ঙ্গম করবেন। আর তখনি সক্ষম হবেন তাওহীদের মূল নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অপসংস্কৃতির সংস্কার অথবা মূলোৎপাটন করতে।

কালেমা তাইয়্যেবার সহজ-সরল অর্থ ও ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ্ নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল। এই কালেমা পড়ার মাধ্যমে আমরা যা স্বীকার করি তা হলো; আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেউ নয় এবং এর সৃষ্টিকর্তা চিরন্তন ও চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব কোথাও নেই। সেই এক আল্লহ্-ই মানুষের ও সারা জাহানের মালিক। আমরা ও আমাদের প্রত্যেকটি জিনিস এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুই তাঁর। রিযিকদাতা তিনি, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হুকুম মত হয়ে থাকে। সুখ ও বিপদ তাঁরই তরফ হতে আসে। মানুষ যা কিছু পায়, তাঁরই কাছ হতে পায়। সকল কিছুর দাতা প্রকৃত পক্ষে তিনি। আর মানুষ যা হারায়, তা প্রকৃতপক্ষে তিনিই কেড়ে নেন। শুধু

তাঁকেই ভয় করা উচিত, তাঁরই সামনে মাথা নত করা উচিত। কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত ও বন্দেগী করা কর্তব্য। তিনি ছাড়া আমাদের মনিব, মালিক ও আইন রচনাকারী আর কেউই নেই। কালেমার অন্তর্নিহিত অর্থ সঠিকভাবে ধারণ করতে পারলে এবং মুহাম্মাদ (সা.) এর দেখানো পথে আল্লাহর সার্বিক হুকুম মেনে চলার মানসিকতা তৈরি করতে পারলেই তাওহীদের আলোকে সংস্কৃতির ভিত রচিত হবে। তারপর একে একে মানুষ প্রেরণের উদ্দেশ্য, মানুষের মূল পরিচয়, বিশ্ব-প্রকৃতিতে মানুষের মর্যাদা, মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি এবং প্রতিনিধির গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জন ও সে আলোকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তাওহীদ ভিত্তিক সংস্কৃতিকে বিকশিত করার জন্য।

তাওহীদের আলোকে তথা ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা। অর্থাৎ মানুষ মহান আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে এ পৃথিবীতে কুরআন সুন্নাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী তার সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। এবং এরই আলোকে মানবাত্মার সার্বিক উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করে পরকালের মুক্তি অর্জন করবে। আল-কুরআনের ভাষায়, একেই 'তাযকিয়া' বলা হয়েছে। আর তাওহীদ ভিত্তিক বা ইসলামী সংস্কৃতির মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৭) ।

আল্লাহ্ আমাদেরকে তাওহীদের আলোকে জীবন গড়ে সফলকাম হওয়ার জন্য তাওফিক দান করুন। আমীন। ■

তথ্যসূত্রঃ

(১) বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান

(২) সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি
https://www.facebook.com/OnuprashShilpigosthi/posts/760141744034555

(৩) ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা- সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী

(৪) তাওহীদের মূল নীতিমালা- ড. আবু আমীনাহ্ বেলাল ফিলিপ্স

(৫) - ঈমানের হাকীকাত - সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী

(৬) - ইসলামী সংস্কৃতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ- ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন
https://banglalittlemag.wordpress.com/2011/06/01/ইসলামী-সংস্কৃতি-উৎপত্তি/

সিরিয়ায় কি কিছু ঘটবে?

মীযানুল করীম

ইসরাইলের মাধ্যমে দ্রুজ সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক এবং বড় দুই শহর দেরা ও হোমসে গোলাবর্ষণে একজনকে হত্যা এবং কয়েকজনকে আহত করার পরও সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার টলেনি।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাথে সিরিয়ার মিল আছে। পূর্ববর্তী দীর্ঘস্থায়ী সরকার বাশার আল আসাদের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সরকার কায়েম করেছিল। তারা শতকরা ১৩ ভাগ নুসাইরি বা আলাবী সম্প্রদায়ের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায়। গত ডিসেম্বরে বাশার আল আসাদ রাশিয়া পালিয়ে যান। দেশে বিপুল সংখ্যক সমর্থক রেখে যান। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্রমশ: নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। আসাদ বাহিনী কয়েকজন পুলিশ হত্যা করলেও তারা সুবিধা করতে পারেনি। কারণ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাদের অনেককে হত্যা করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন গত ডিসেম্বরে বাশার আল আসাদকে উৎখাতকারী দলের নেতা আহমদ আল শারার। তিনি প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে সৌদি আরব সফর করেছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসাবে তিনি যথাযথ মর্যাদা পান। তিনি ইরাকও সফর করেছেন সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসাবে। ইরানে তিনি কাতারের আমিরের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তখন সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। বাশার আল আসাদের পক্ষে পরাশক্তি রাশিয়ার সক্রিয় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তাকে রক্ষা করা যায় নাই। এর কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন, হত্যা, গুম, মারাত্মক গ্যাস প্রয়োগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে গেলেও ভারত তাকে বাংলাদেশের ক্ষমতায় রক্ষা করতে পারেনি। হাসিনার পক্ষে রাশিয়ার মতো কোনো পরাশক্তির সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলেও প্রতিবেশী ভারত দু'হাত খুলে তাকে সাহায্য করে। এখনো ভারত শেখ হাসিনাকে দু'হাত খুলে সাহায্য করে যাচ্ছে। সিরিয়া আজ মার্কিনপন্থী ও তুরস্কপন্থী কুর্দি যুবক এবং সিরিয়ার অন্তবর্তীকালীন সরকার, সর্বোপরি ইসরাইলের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বাশার আল আসাদের সমর্থকরা তো আছেই। ওরা শতকরা ১৩ ভাগ আরবি সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে কেউ জিততে পারে না। বাশার আল আসাদের বাহিনীও জিততে পারবে না। ওরা ক্ষমতায় থাকতে সমর্থন করেছে নুসাইরি সম্প্রদায়কে।

এখনো তারা করছে। ওরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমর্থন করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ওদের উপর নির্ভরশীল।

সিরিয়ার নেতা আহমেদ আল শারা এক মার্কিন কংগ্রেসম্যান এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন বলে জানিয়েছে সিরিয়ার প্রেসিডেন্সি।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পতনের পর এটাই মার্কিন আইন প্রণেতার সিরিয়ায় প্রথম সফর। প্রেসিডেন্ট দফতরের বিবৃতিতে বলা হয়, সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল শাইবানী এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসম্যান কোরি মিলসের নেতৃত্বে রিপাবলিকান দলীয় অপর রাজনৈতিক মার্কিন স্টুইজম্যান সিরিয়ায় পৌঁছান। উভয়েই ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির সদস্য। গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে ইসলামপন্থী সংগঠন হায়াত তাহেরীর আল শাম এর নেতৃত্বে গঠিত জোট বাশার আল আসাদকে ক্ষমতা থেকে সরানের পরে ওয়াশিংটন সিরিয়ার নতুন নেতার গ্রেপ্তারে পুরস্কার ঘোষণার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়।

তৎকালীন এক সিনিয়র মার্কিন কূটনীতিক জানান, নতুন কর্তৃপক্ষের সাথে প্রথম বৈঠকে ইতিবাচক বার্তা পাওয়ার পরে শারার বিরুদ্ধে পুরস্কার প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় যুক্তরাষ্ট্র। শারা অনুগতদের পরিচালিত নতুন সরকার আসাদ আমলে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য জোরালো চাপ দিচ্ছে, যাতে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং অবকাঠামো পুনর্গঠন সম্ভব হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেছে। তবে দেশটি ও তার মিত্ররা পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আগে নতুন সরকারের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছে। যুক্তরাষ্ট্র একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের স্বাগত জানিয়েছে তবে সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ সহ বেশ কিছু বিষয়ে অগ্রগতি দাবি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে, দেশটিতে আইএসবিরোধী মিশনে নিযুক্ত সেনা সংখ্যা অর্ধেক নামিয়ে আনা হবে। এতে সিরিয়ায় মার্কিন সেনার সংখ্যা ১০০০ এর নিচে নেমে আসবে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে সিরিয়ার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। দেশটির প্রায় ৯০% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে।

এএফপি জানাই, ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিতব্য আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বসন্তকালীন বৈঠকে অংশ নেবেন সিরিয়া মন্ত্রিসভার সদস্য ও দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান। এমন এক সময়ে মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের এই সফর হলো, যখন ওয়াশিংটন সিরিয়ায় কাছাকাছি সময়ের মধ্যে হামলার বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে।

মার্কিন দূতাবাসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, পর্যটকের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। উল্লেখ্য, দামেস্ককে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস ২০১২ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে। ওই বছরই বাশার আল আসাদের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দমন পীড়ণের মধ্য দিয়ে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সিরিয়ার নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এ পতাকা উত্তোলন করেন সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল শাইবানি। তিনি এটিকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেন। গত ডিসেম্বরে

সিরিয়ার সাবেক স্বৈরশাসক বাশার আল আসাদকে উৎখাত করেন বিদ্রোহীরা। এরপর নতুন সরকার গঠন করা হয়। তিন তারকা খচিত এই পতাকা আসাদের দমন মূলক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

কাতারভিত্তিক সম্প্রচার মাধ্যম আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আল শাইবানি বলেন, সিরিয়ানরা ১৪ বছর ধরে যে দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিল, নতুন পতাকা উত্তোলন ছিল তার প্রথম ধাপ। বিক্ষোভকারীদের উপর আসাদের দমনমূলক পদক্ষেপের কারণে দেশে গৃহযুদ্ধ দেখা দিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, এই পদক্ষেপ শুধু একটি প্রতিকী পদক্ষেপ নয় বরং এটি সিরিয়ার জনগণের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানায় এবং তাদের বিজয়ের মুকুট পড়ায়। এএফপির বিভিন্ন ছবিতে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সদর দপ্তর সফরে এসে তাকে নিরাপত্তা কাউন্সিলের বৈঠকে অংশ নিতে দেখা গেছে।

সিরিয়ার একটি উপকূলীয় এলাকায় দেশটির ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদের অনুসারীদের সাথে দেশটির এখনকার শাসকদের অনুগত বাহিনীর তীব্র লড়াইয়ে ব্যাপক প্রাণহানি হয়েছে। ডিসেম্বরে বাসার আল আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় বসার পর এটাই দেশটিতে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। সংঘর্ষে ৭০ এর বেশি লোক মারা পড়েছে বলে জানিয়েছে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণকারী গোষ্ঠী ব্রিটেনভিত্তিক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস। যে দুই বন্দর নগরীতে এই সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে সেই লাতাকিয়া ও তারতুজে কারফিউ জারি করা হয়েছে। লাতাকিয়ায় একটি নিরাপত্তা অভিযান চালানোর সময় সিরিয়ার সরকারি বাহিনী অতর্কিতে হামলার সম্মুখীন হলে সংঘর্ষের সূচনা হয়।

পরে সেখানে সরকার সমর্থিত গোষ্ঠী গুলোর আরো সেনা পাঠানো হয়, অনলাইনে আসা অনেক ভিডিওতে ওই এলাকায় গুলি বিনিময় এর চিত্র দেখা গেছে। উপকূলীয় এ অঞ্চলটি শিয়া আলাভি সম্প্রদায়ের প্রাণকেন্দ্র ও বাশার আল আসাদ পরিবারের শক্ত ঘাঁটি।

পেন্টাগনের মুখপাত্র শন পার্নেল এক বিবৃতিতে বলেছেন, সিরিয়ায় মার্কিন বাহিনীকে একত্রিকরণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। এই সুপরিকল্পিত এবং শর্ত ভিত্তিক প্রক্রিয়ার ফলে আগামী সময়গুলোতে সিরিয়ায় মার্কিন বাহিনীর সংখ্যা এক হাজারেরও কম হবে। এই অঞ্চলের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সামরিক কমাণ্ডারের কথা উল্লেখ করে পার্নেল আরো বলেন, এই একত্রীকরণের সময় মার্কিন কেন্দ্রীয় কমাণ্ড সিরিয়ায় আইএস অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

আসাদের উৎখাতের পর ওয়াশিংটন সিরিয়ায় আই এস এর বিরুদ্ধে সাময়িক পদক্ষেপ জোরদার করেছে। যদিও সম্প্রতি তারা ইয়েমেনের প্রতি বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে হামলার দিকে মনোনিবেশ করেছে। এদিকে ইরাকও সেখানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের উপস্থিতির অবসান চেয়েছে।

সিরিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল শারা প্রতিবেশী ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চাচ্ছেন। মার্কিন গণমাধ্যম ব্লুমবার্গকে এ কথা বলেছেন মার্কিন কংগ্রেস ম্যান কোরি মিলস। মিলস সিরিয়ায় শারার সঙ্গে বৈঠক করে গেছেন। মিলস বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ইসরাইলের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি 'আব্রহাম

অ্যাকর্ডস'- এ সিরিয়াকে যুক্ত করতে আগ্রহী শারা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় তার আগের মেয়াদে এই চুক্তি হয়েছিল।

সে সময় এই চুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও মরক্কো। মিলস বলেন, শারার সঙ্গে তার বৈঠকে সিরিয়ার উপর দেওয়া মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইসরাইলের সঙ্গে দেশটির শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাব্য বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে।

সিরিয়ায় কি ঘটবে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অন্তবর্তী কালীন সরকারের মতো জনসমর্থন রয়েছে। এইজন্য আসাদ বাহিনী পারছে না। ওরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ওদের বিরুদ্ধে। এই অবস্থা থাকলে ওরা পারবেনা। ইসরাইল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক ছাড়াও দেরা ও হোমসের মত বড় শহরে হামলা চালিয়েছে। এতে কয়েকজন হতাহত হয়। ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায়ের উপর ইসরাইল নির্ভরশীল। ইসরায়েল যত হত্যা করুক তারা জন সমর্থন পাবে না। ধ্রুজরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করলেও মুসলমানরা ওদেরকে মুসলমান হিসেবে গ্রহণ করে না ওদের বিকৃত বিশ্বাসের কারণে। ওরা দুই একটা দেশেই সীমাবদ্ধ। আর ইসরাইল যতই হত্যা লীলা চালাক না কেন ওরা জনসমর্থন পাবে না গাজায় অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানোর কারণে। ■

আল ফালাহ বিজ্ঞাপন

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি কিন্তু আমরা জানি না আমাদের এ সালাত আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়, কবুল ও গ্রহণযোগ্য হয় কিনা?
কিভাবে সালাত আদায় করলে আমাদের সালাত আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় মকবুল ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

আমির হোসেন
মগবাজার, ঢাকা

উত্তর ঃ প্রশ্নটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্ন। এটি সালাত আদায়কারী সকল মুসলিমেরই মনের কথা।

এর উত্তরে আমরা বলব- সালাতের দুইটি দিক রয়েছে:

একটি হলো বাহ্যিক বা সালাত আদায় করার নিয়ম ও পদ্ধতিগত দিক। অপরটি হল সালাতের আভ্যন্তরীণ ও অন্তর্নিহিত দিক। এটি সালাতের রূহ ও প্রাণ।

সালাতের বাহ্যিক দিক হলো সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ রক্ষা করে সালাত আদায় করা। সালাতের ফরয বিধানগুলো যথাযথভাবে আদায় ও পালন করা ফরয। এর মধ্যে একটি ফরযও যদি বাদ যায় বা বাদ পড়ে তাহলে সে সালাত আদায় হলো না। সে সালাদ পুনরায় আদায় করতে হবে। ওয়াজিবসমূহও যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। একটি ওয়াজিবও যদি বাদ যায় বা বাদ পড়ে তাহলে সে সালাতে সাহু সাজদা দেয়া ওয়াজিব। অন্যথায় সে সালাদ শুদ্ধ হবে না। সে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। সালাতে সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ পরিপালন করে আদায় করা হলে সে সালাত হবে সুন্দর ও মুকাম্মাল সালাত। সালাতে কোন সুন্নত বা মুস্তাহাব বাদ গেলে সে সালাত বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য হবে না তবে সালাতের সৌন্দর্য বিনষ্ট হবে এবং পরিপূর্ণতায় ঘাটতি থেকে যাবে। অতএব, সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবসহ সালাত আদায় করা হলে সে সালাত হবে পরিপূর্ণ সালাত।

সালাত আদায় করার সময় পবিত্র শরীর ও মন নিয়ে এই নিয়ত ও সংকল্প করবে যে, আমি আমার পরম করুণাময় ও বিশ্ব জাহানের মহান স্রষ্টা ও মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সামনে দণ্ডায়মান। তিনি আমাকে দেখছেন এবং আমার মন ও অন্তরের অবস্থাও তিনি সম্যক অবগত। তাঁর কাছে আমার কোন কিছুই গোপন ও অজানা নেই, সবই তিনি দেখছেন ও জানেন। এই ধ্যানমগ্ন হয়ে, একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে হাযির নাযির জেনে মনকে সালাতে নিবিড় ও নিবিষ্ট করে আল্লাহর ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে প্রকম্পিত মনে সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ানো ও সালাত আদায় করা প্রত্যেক সালাত আদায়কারীর কর্তব্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ –ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ

"নিশ্চিতই মুমিনগণ সাফল্যমন্ডিত হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে খুশূ ও খুযূ তথা ভীতি ও বিনম্র ভাব অবলম্বন করে।" সূরা আল মুমিনুন " ১-২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'তুমি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত তথা সালাত আদায় করবে যেন তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখছো। সালাতে তোমার একাগ্রতা, মনোযোগ ও মননিবেশ তথা খুশু খুযু যদি এই পর্যায়ের না হয় অর্থাৎ যদি তুমি তাঁকে না দেখো তবে এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় ও বদ্ধমূল রাখবে যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। সহিহ মুসলিম, অধ্যায় : ঈমান, হাদিস-১

অতএব সালাতে বান্দার একাগ্রতা, মননিবেশ ও মনোযোগ এই পর্যায়ের হওয়া কাঙ্খিত যে, সালাত আদায় করা অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান এবং আল্লাহকে সে দেখছে। আর এটাই হল বান্দাহর কাঙ্ক্ষিত মানের সালাত।

সালাতে বান্দাহর একাগ্রতা, মনোযোগ ও মননিবেশ যদি এই পর্যায়ের না হয় যে, সে মহান আল্লাহকে দেখছে, তাহলে অন্তত কমপক্ষে এই পর্যায়ের হওয়া চাই এবং হওয়া জরুরি যে, আমি মহান আল্লাহর সামনে হাযির ও দণ্ডায়মান। তিনি আমাকে দেখছেন এবং আমার মন ও অন্তরের অবস্থাও তিনি দেখছেন ও জানেন। তাঁর কাছে আমার কোন কিছুই গোপন ও অজানা নেই, সবই তিনি দেখেন ও জানেন। মনে ও অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আল্লাহর ভয়ে ভীত ও প্রকম্পিত মনে আল্লাহকে হাযির-নাযির জেনে আল্লাহর সামনে অতিশয় বিনীত ও বিনম্র হয়ে একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করা চাই। পুরো সালাতেই মনের এই অবস্থা সক্রিয় রাখা চাই।

সালাতে সূরা কিরআত যা পড়া হবে তা বুঝে বুঝে পড়া চাই এবং সূরা কিরআতের কাঙ্খিত আবেদন মনকে প্রভাবিত করা চাই। এভাবে মনকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সালাতে হাজির ও সক্রিয় রাখা একান্ত কাম্য।

প্রশ্ন-২ ঃ রাত দিন ২৪ ঘন্টায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ এবং এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ওয়াজিব। এ ওয়াজিব সালাত হল সালাতুল বিতর। সালাতুল বিতর তিন রাক'আত না এক রাক'আত এ নিয়ে আমাদের সমাজে কখনো কখনো ঝগড়া হতে দেখা যায়। আমার জানার বিষয় হলো আসলে সালাতুল বিতর কত রাক'আত এবং এ সালাতুল বিতর আদায় করার সময় কখন? এবং আদায় করার নিয়ম কি?

হাফিজুর রহমান
হালিশহর, চট্টগ্রাম

উত্তর ঃ সালাতুল বিতর আদায় করার ওয়াক্ত হল, সালাতুল ইশা আদায়ের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। এ সালাত মূলত রাতের, গভীর রাতের কিংবা শেষ রাতের সালাত। যারা রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে থাকেন তারা তাহাজ্জুদের পরই সালাতুল বিতর আদায় করে থাকেন।

সালাতুল ভিতরের রাক'আত সংখ্যা ও আদায় করার নিয়মঃ

সালাতুল বিতর রাতের সালাত হওয়াতে এ সালাতের রাক'আতের ক্ষেত্রে এবং আদায় করার নিয়ম ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনেক প্রশস্ততা রয়েছে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ এ সালাত তিন রাক'আত আদায় করে থাকেন। আবার কেউ কেউ এক রাক'আত আদায় করে থাকেন। মূলত সালাতুল বিতর এক ও তিন রাক'আতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي أُخِرِهِنَّ

'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামাযের সংখ্যা ছিল তেরো রাক'আত। এর মধ্যে পাঁচ রাক'আত তিনি বিতর পড়তেন। এ পাঁচ রাক'আত পড়া শেষ করেই তিনি বসতেন। মুয়াযযিন আযান দিলে তিনি উঠে নীরবে দুই রাক'আত নামায পড়তেন।' (জামি'আত তিরমিযি, অধ্যায়ঃ সালাতুল বিতর, হাদীস নং-৪০৯)

১৩ রাক'আতে মধ্যে প্রথম আট রাক'আত পড়তেন দুই রাক'আত দুই রাক'আত করে। এরপর এক সালামে ও এক বৈঠকে পাঁচ রাক'আত আদায় করতেন। এভাবে তিনি তার রাতের সালাতকে বিতর বা বেজোড় সালাতে পরিণত করতেন।

অন্য একটি হাদিসে এসেছে ,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কিংবা অন্য কোনো সময়ে (রাতের বেলা) ১১ রাক'আতের বেশি সালাত আদায় করতেন না।' (সহীহ মুসলিম, মুসাফিরের সালাত, হাদীস-১২১)

এর অর্থ হল অধিকাংশ সময় তিনি রাতের সালাত ১১ রাক'আত আদায় করতেন। আবার কখনো এর বেশিও আদায় করতেন। কখনো এর কমও আদায় করতেন। এ তারতম্য হতে পারে তার শরীর ও মনের অবস্থা ভেদে অথবা উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে অথবা বৈধতার বর্ণনা হিসেবে।

এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো সালাতুল বিতর সাত রাক'আত ও নয় রাক'আত আদায় করতেন। সাত রাক'আত আদায় করতেন একাধারে, সপ্তম রাক'আত আদায় করার পর বসতেন এবং তাশাহুদ দরূদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতেন।

সালাতুল বিতর নয় রাক'আত আদায় করার নিয়ম হলো, পাঁচ ও সাত রাক'আতের মত মাঝে না বসে একাধারে আট রাক'আত আদায় করতেন এবং আট রাক'আত আদায় করার পরে বসতেন। অতঃপর কেবল তাশাহুদ পড়ে দরূদ ও দোয়া মাসূরা না পড়ে দাঁড়িয়ে

যেতেন এবং নবম রাক'আত আদায় করে বসে তাশাহুদ, দরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতেন।

সালাতুল বিতর বা রাতের সালাত ১১ রাকাত আদায় করার নিয়ম হল:

দুই রাক'আত দুই রাক'আত করে ১০ রাক'আত আদায় করা এবং প্রতি দুই রাক'আতের পর সালাম ফিরানো। এভাবে পাঁচ সালামে ১০ রাক'আত আদায় করার পর দাঁড়িয়ে আলাদা ভাবে এক রাক'আত আদায় করা।

সালাতুল বিতর তিন রাক'আত একাধিক নিয়মে আদায় করা যায়:

এক. একাধারে তিন রাক'আত আদায় করে বসে যথা নিয়মে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা।

দুই. দুই রাক'আত আদায় করে বসে কেবল তাশাহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাক'আত আদায় করে বসে যথারীতি সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা।

তিন. দুই রাক'আতের পর বসে তাশাহুদ, দুরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় দাঁড়িয়ে এক রাক'আত আদায় করে বসে যথারীতি সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা।

সালাতুল বিতর এক রাক'আতও আদায় করার বিধান আছে। সেটা হলো- সুন্নাতসহ সালাতুল ইশা কিংবা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার পর দাঁড়িয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করা। সালাতুল বিতর এক রাক'আত সাধারণত তাহাজ্জুদের পরই আদায় করা হতো। তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে করতে যখন দেখা যেত সুবহে সাদিক অত্যাসন্ন তখন সালাতুল বিতর এক রাক'আত আদায় করা হতো।

সালাতুল বিতরে দু'আ কুনুত পড়া ওয়াজিব। দু'আ কুনুত শেষ রাক'আতে পড়তে হয়।

দু'আ কুনুত পাঠ করার দুইটা নিয়ম আছে -

এক. রুকুর আগে : সুরা ফাতিহা ও সূরা মিলানোর পর তাকবীর বলে দু'হাত উঠিয়ে পুনরায় হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে দু'আ কুনুত পাঠ করা।

দুই. রুকুর পর : রুকুর পরে দাঁড়িয়ে মুনাজাত করার মত দু'হাত উঠিয়ে দু'আ কুনুত পাঠ করা।

সালাতুল বিত্তর **১৩, ১১, ৯, ৭, ৫, ৩ ও ১** রাক'আত ।

সবই সুন্নাহ ও হাদিস সম্মত। তবে এর মধ্যে যে ব্যক্তি বেশি আদায় করবেন তিনি বেশি সাওয়াব পাবেন। আর যিনি কম আদায় করবেন তিনি সে অনুপাতে কম সওয়াব পাবেন। এ নিয়ে কোন প্রকার গোঁড়ামি বা ঝগড়া বিবাদ করার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন-৩ ঃ 'বারযাখ' এটি কোন ভাষা? এর অর্থ কি? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

আবদুল হামিদ

মতলব, চাঁদপুর

উত্তর ঃ বারযাখ আরবি শব্দ ও কুরআন মাজিদের ভাষা। এর অর্থ হলো পর্দা, যবনিকা,

মধ্যবর্তী স্থান। এর সাথে আলম শব্দটি যুক্ত করলে এর অর্থ পরিস্কারভাবে বুঝা যাবে, যেমন আলামে বারযাখ অর্থাৎ ইহজগতের অন্তরালে এক অদৃশ্য জগৎ। মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে রুহ যে স্থানে অবস্থান করে তাকে আলমে বারযাখ বলা হয়। প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যুর পর থেকেই তার বারযাখী জীবন শুরু হয় এবং ইসরাফিল আলাইহিস সালাম এর তৃতীয়বার সিংগায় ফুৎকারের মাধ্যমে আলামে বারযাখ বা বারযাখী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তারপরই শুরু হবে আলামে আখেরাত বা পরকালীন জীবন। আলামে বারযাখ আলামে দুনিয়া তথা ইহকাল ও পরকালের মধ্যে বিরাট যবনিকা (আড়াল) হয়ে রয়েছে। (আল আকিদাতুল ইসলামিয়া- ৬৪২-৬৪৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"তাদের সামনে বারযাখ (পর্দা বা আড়াল হয়ে) থাকবে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত।" (সূরা আল মুমিনুন-১০০)

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামে মানব জীবনের অর্থাৎ মানুষের রূহ সৃষ্টির পর থেকে আখেরাত পর্যন্ত চারটি স্তর বা আলমের ধারণা পাওয়া যায়।

প্রথম স্তর ঃ আলামের আরওয়া বা রূহ জগত। এ জগৎ থেকে রূহসমূহ পর্যায়ক্রমে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আসতে থাকবে।

দ্বিতীয় স্তর ঃ আলমে আজসাম বা বস্তু জগত বা দুনিয়ার জীবন।

এ স্তরটি কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

তৃতীয় স্তর ঃ আলামে বারযাখ, মৃত্যুর পরবর্তী অদৃশ্য জগৎ বা কবরের জীবন। প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত এই জগতটি দীর্ঘ হবে।

চতুর্থ স্তর ঃ আলমে আখিরাত, পরকাল বা পুনরুত্থান ও তারপরের অনন্ত জীবন ও জগত। যার শুরু আছে শেষ নেই। এ জগতেই রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম।

জান্নাত হলো অফুরন্ত নে'আমত সামগ্রীতে পরিপূর্ণ সীমাহীন ও কল্পনাতীত সুখ, শান্তি, আরাম -আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জায়গা। সেখানে নেই বিন্দুমাত্র দুঃখ, কষ্ট ও ক্লেশ ক্লান্তি। আছে শুধু সীমাহীন আরাম-আয়েশ, সুখ আর সুখ এবং সীমাহীন শান্তি আর শান্তি।

এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

'জান্নাত এত বিশাল ও সীমাহীন নিআ'মাতে পরিপূর্ণ যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং কোন মানব অন্তর কখনো কল্পনাও করেনি।' ঠিক এর বিপরীত হলো জাহান্নাম ও জাহান্নামের শাস্তি। ■

ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত
বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

পাইকারী ৩৭% এবং খুচরা ২৫% কমিশনে ক্রয় করুন

নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	দারসুল কুরআন সংকলন-১-২	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৪৫/-
২	দারসুল কোরআন সিরিজ-১-৩	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ	৪১০/
৩	দারসুল হাদীস সিরিজ-১-৩	ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া	৩৬০/-
৪	কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা	খুররম মুরাদ	১৭০/-
৫	আল কুরআন এক মহাবিস্ময়	ড. মরিস বুকাইলি	১০০/-
৬	সাহীহ্ আল্ বুখারী ১-৫	ইমাম বুখারী (রহ)	২৭৭০/-
৭	সহীহ মুসলিম ১-৮	ইমাম মুসলিম (র)	৪১২০/
৮	জামে আত-তিরমিযী ১-৬	ইমাম তিরমিযী (র)	২২০০/-
৯	সুনান আবু দাউদ ১-৬	ইমাম আবূ দাউদ (র)	২২৮০/-
১০	সুনান আন-নাসাঈ ১-৬	ইমাম নাসাঈ (র)	২১৬০/-
১১	মুসনাদে আহমাদ (১)	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)	৩৫০/
১২	রিয়াদুস সালেহীন ১-৪	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১৩১০/-
১৩	শু'আবুল ঈমান	ইমাম বাইহাকী (র)	১২০/-
১৪	সীরাতে ইবনে হিশাম	আকরাম ফারুক অনূদিত	৪৫০/-
১৫	আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা)	ড. আহমদ আলী	৭৫০/-
১৬	উসমান ইবনু আফ্ফান (রা)	ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক	৩৫০/-
১৭	আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ১-৭	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	২৩৪০/-
১৮	তাবি'ঈদের জীবনকথা ১-৪	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	১১২০/-
১৯	ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৮০/-
২০	ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১৬০/-
২১	কবিরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী (র)	১৮০/-
২২	আমরা সেই সে জাতি (১-৩)	আবুল আসাদ	৩৮০/-
২৩	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	আব্বাস আলী খান	৪২০/-
২৪	আল আকসা মসজিদের ইতিকথা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	৮০/-
২৫	উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭৫/-
২৬	মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোষাক	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (র)	৬০/-
২৭	ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী	ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী	১৪০/-

২৮	নারী অধিকার পর্দা ও নারী পুরুষে মুসাফাহা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১০০/-
২৯	পর্দার আসল রূপ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৩০	দি সোর্ড অব আল্লাহ	লে. জেনারেল এ.আই. আকরাম (অব.)	৩৫০/-
৩১	দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়া	ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক	১৪০/-
৩২	মদিনা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	২০০/-
৩৩	মক্কা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	৬০০/-
৩৪	ইবনুল কায়্যিম (রহ)	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	৪৪০/-
৩৫	আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা)	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৩৬	আল্লাহর দিকে আহ্বান	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৪০/-
৩৭	ইসলামী নেতৃত্ব	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৩৮	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পঠিত দু'আ	ইমাম ইবনে কাইয়েম (র)	১৩০/-
৩৯	ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট ও কর্মপদ্ধতি	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪০	সুদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪১	আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১-৩)	আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র)	৪২০/-
৪২	আল্লাহর পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৪৩	সফল জীবনের পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৪৪	রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি	ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ	৪০০/-
৪৫	ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৬	তাযকিয়াতুন নাফস	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৭	ইসলামের শাস্তি আইন	ড. আহমদ আলী	২২০/-
৪৮	ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	২২০/-
৪৯	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম	৩৫/-
৫০	আল্লাহর হক মানুষের হক	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৫০/-
৫১	ইলমুল ফিকহ ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ	ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক	৪০০/-
৫২	ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনি ও হাদীস চর্চা	ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	৪০০/-
৫৩	নামায কায়েম কর	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	৩০/-
৫৪	রোযার তাৎপর্য ও বিধিবিধান	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১১০/-
৫৫	গবেষণাপত্র সংকলন (১-২৫)	সংকলিত	২১৯৫/-
৫৬	যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৫৭	ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৬০/-

যোগাযোগ : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.dhakabic.com